

দৃষ্টিপাত

যাযাবর

প্রণীত

লিউ এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড

কলকাতা

প্রথম মুদ্রণ—আশ্বিন, ১৩৫৩

তিন টাকা

প্রচ্ছদপট—পি, দেব ।

নিউ এজ পাবলিশাস' লিমিটেডের পক্ষে
জে, এন, সিংহ রায় কর্তৃক প্রকাশিত
২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলকাতা ।

শ্রীগোবিন্দ প্রেস, ৫, চিত্তামণি দাস লেন, কলকাতা থেকে
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত ।

বিজ্ঞপ্তি

আমাদের বিশ্বাস, 'দৃষ্টিপাত' বাংলা সাহিত্যের প্রথম বেল-লেটার্স,—
Belles Lettres। এর আগে বাংলায় ঠিক এই ধরনের কোনো বই বেরিয়েছে
বলে আমাদের জানা নেই।

খণ্ডিতাকারে এই রচনাটি মাসিক বহুসমীক্ষিত বেরিয়েছিল। ১৩৫২
সালের আষাঢ় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকরূপে ১৩৫৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম
এগারোটি পরিচ্ছেদ এবং ১৩৫৩ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় তেরো ও
চৌদ্দ পরিচ্ছেদ দুটি ছাপা হয়। ষোল্ল পরিচ্ছেদটি এই বইতে নতুন যোগ করা
হয়েছে। যে-পত্রসমষ্টি থেকে এই শেষোক্ত পরিচ্ছেদটি সংকলিত, মাঝখানে
তা হারিয়ে যাওয়ার ফলে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করা যায়নি।

এই পুস্তক প্রকাশে আমরা ঋণ কাছে সব চেয়ে বেশী ঋণী, অত্যন্ত
সহজবোধ্য কারণেই তাঁর নাম প্রকাশে বাধা আছে। তাঁর ব্যক্তিগত পত্রগুলি
ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে সেই আত্মগোপন-ইচ্ছুক মহিলা আমাদের অশেষ
কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে রইলেন।

গত এক মাস ধরে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের ফলে কলকাতায় মানুষের
স্বাভাবিক কাজকর্মে বিশৃঙ্খলার শেষ নেই। তাতে পুস্তক মুদ্রণ কার্কেও বহু
বাধা বিঘ্ন ঘটেছে। সংকলয়িতা ও আর একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা
যে সহায়তা পেয়েছি, তার জন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সর্বদা উৎসাহ এবং
পরামর্শ দেওয়া ছাড়াও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বইর আগাগোড়া প্রুফ দেখে দিয়ে ঋণী
এ-সময়ে এই পুস্তক প্রকাশের পথ সুগম করেছেন, শুধু মাঝুলী ধন্যবাদ দিয়ে
তাঁদের সেই বহুসমীক্ষিত পরিশোধ করা যাবে না বলেই তাঁদেরও নামোক্তে
বিরত রইলাম।

পুস্তকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিহিত বানান পদ্ধতি অনুসরণ করা
হয়েছে।

সংকলয়িতার নিবেদন

এই রচনাটির একটু ভূমিকা আবশ্যক।

১৯৩৭ সালে একটি বাঙালী যুবক লণ্ডনে ব্যারিস্টারি পড়িতে যায়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে গাওয়ার স্ট্রিটের ভারতীয় আবাসটি জার্মান বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হইলে আত্মীয়বর্গের নির্বন্ধাতিশয়ে যুবকটি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসে। সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের আলোচনার প্রাক্কালে বিলাতের একটি প্রাদেশিক পত্রিকা তাহাকে তাহাদের নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে পাঠান। লণ্ডনে অবস্থানকালে ঐ পত্রিকায় সে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখিত।

দিল্লীতে যাইয়া যুবকটি তাহার এক বান্ধবীকে।কতগুলি পত্র লেখে। বর্তমান রচনাটি সেই পত্রগুলি হইতে সংকলিত। পত্রলেখক ও পত্রাধিকারিণীর একমাত্র একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রসঙ্গ ব্যতীত পত্রগুলির আর কিছুই বাদ দেওয়া হয় নাই, যদিও পত্রে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীদের যথার্থ পরিচয় গোপনের উদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে নাম ধামের পরিবর্তন অপরিহার্য হইয়াছে।

এই স্বল্পপরিসর পত্ররচনার মধ্যে লেখকের যে সাহিত্যিক প্রতিভার আভাস আছে হয়তো উত্তরকালে বিস্তৃততর সাহিত্যচর্চার মধ্যে একদা তাহা যথার্থ পরিণতি লাভ করিতে পারিত। গভীর পরিতাপের বিষয়, কিছুকাল পূর্বে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহার অকাল মৃত্যু সেই সম্ভাবনার উপরে নিশ্চিত যবনিকা টানিয়া দিয়াছে।

দৃষ্টিপাত

এক

সাত ঘণ্টা আকাশচারণের পরে উইলিংডন এয়ারপোর্টে ভূমি স্পর্শ করা গেল। বিমানঘাঁটিটি আকারে বৃহৎ নয়, কিন্তু গুরুত্ব প্রধান। পূর্ব গোলাধর্ষে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইঙ্গ মার্কিং ও চৈনিক সমর-বিশারদদের এটা আগমন ও নিষ্ক্রমণের পাদপীঠ। প্রাত্যহিক পত্রিকার সংবাদস্তুস্তে এর বহুল উল্লেখ।

আমাদের বাহনটি ডগ্‌লাস্ ডাবল এঞ্জিন জাতীয়। খেচর কুলপঞ্জীতে ফ্লাইং ফোর্ট্রেস ও লিবারেটার প্লেনের পরেই এর স্থান। নিকব না হলেও ভঙ্গ কুলীন বলা যেতে পারে। এর আকার শিলাল, গর্জন বিপুল ও গতি বিদ্যুতপ্রায়। পুরাণে পুষ্পক রথের কথা আছে। তাতে চেপে স্বর্গে যাওয়া যেত। আধুনিক বিমান রথের গন্তব্যস্থল মর্তলোক। কিন্তু সারথি নিপুণ না হলে যে-কোন মুহূর্তে রথীদের স্বর্গপ্রাপ্তি বিচিত্র নয়।

বিমানঘাঁটির কর্মকর্তা বাঙালী। ভদ্রলোক বয়সে তরুণ এবং ব্যবহারে অমায়িক। এর স্ত্রী মণিকা মিত্রের সৌন্দর্য-খ্যাতি নয়াদিল্লীর অনেক বঙ্গ ললনার মর্মবেদনার কারণ।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে মাটিতে নামতে হয়। বিস্ময়কর এক অনুভূতি। এই তো সকাল বেলায় ছিলাম কলকাতায়। দমদমের পথে গ্যাসের আলোগুলি সব তখনও নেভেনি। ফুটপাথে খাটিয়ার উপরে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে হিন্দুস্থানী দোকানদারেরা নিদ্রামগ্ন, কর্পোরেশনের উড়ে কুলীরা জলের পাইপ থেকে গঙ্গোদকের

দৃষ্টিপাত

দ্বারা রাজধানীর বহুজনমর্দিত পথগুলির ক্রেদমুক্তির আয়োজনে ধাবমান; সাইকেলের হাতলে স্তূপীকৃত খবরের কাগজ চাপিয়ে হকাররা যাচ্ছে এ দুয়ার থেকে ও দুয়ার। সতৃপ্ত রজনীর সুষুপ্তির রেশ ধরণীর বুক থেকে তখনো নিঃশেষে মুছে যায়নি। (আকাশে কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডিত চাঁদ দূরবর্তী তরুশ্রেণীর শীর্ষে রুগ্মা রমণীর নিষ্প্রভ মুখের মতো ছাতিহীন।) মিট মিট করে জ্বলছে গুটি কয়েক মুমূর্ষু তারা। পথের পাশে গাছের ডালে ডালে পাখীদের কাকলী শুরু হয়েছে ধীরে ধীরে। দমদম বিমানঘাঁটির দূরবর্তী পাটকলের উত্তুঙ্গ চিমনীটা আকাশের পটে আঁকা আবছা ছবির মত দেখাচ্ছে। বিমান কোম্পানীর সাদা ধবধবে যুনিফর্ম পরিহিত শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা টিকিট পরীক্ষা ও মাল ওজন ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত সমস্ত। দূরে বারাসতের রাস্তা দিয়ে চলেছে সারিবন্দী মন্তরগতি গরুর গাড়ি, বাতাসে ভেসে আসছে তাদের তৈলতৃষিত চাকার ক্ষীণ আর্ন্তনাদ।

দেড়টা বাজতেই নয়াদিল্লী। মাঝে শুধু বামরৌলীতে ঘণ্টা খানেকের বিশ্রাম,—প্রাতরাশের প্রয়োজনে। ব্যবস্থা থাকলে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর পুনরায় দিল্লী থেকে সন্ধ্যা নাগাদ কলকাতায় ফিরে মেট্রোতে সিনেমা দেখা যায়। রেলযোগে প্রায় দেড় দিনের পথ। দূরকে নিকট এবং দুর্গমকে সহজাধিগম্য করেছে যে-বিজ্ঞান তার জয় হোক।

মনে আছে শৈশবের কথা। ছপুরে গৃহকর্তারা কর্মস্থলে। আহাঙ্গারাদির পরে প্রাত্যহিক দিবানিজার অব্যর্থ ঔষধ বন্ধিমের উপাশাস হাতে মা পাশের ঘরের মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শান। তাঁর সেই স্বল্পায়ু বিশ্রামক্ষণটি যাতে চপলস্বভাব বালকের সশব্দ দৌরাঙ্কো খণ্ডিত না হয় সেজ্ঞা পিতামহী নাতিকে নিয়ে বসেছেন। বৃদ্ধা তাঁর ক্ষীণদৃষ্টি চক্ষুর উপরে নিকেলের চশমা জোড়াটা এঁটে যুহু স্বরে পড়ছেন কৃত্তিবাসী রামায়ণ। খানিকক্ষণ এপাশ, ওপাশ, উসখুশ করে মাথার ঝালিগাটা নিয়ে লোফালুফির পরে হঠাৎ এক সময়ে কানে আসতো

দৃষ্টিপাত

রাবণ বসিল চড়ি পুষ্পক রথেতে ।

বিদ্যুতের সম গতি আকাশ পথেতে ॥

উৎকর্ণ হয়ে উঠতাম । অরণ্য, পর্বত, সাগর জঙ্গম
পরে রথ চলেছে শূন্য পথে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো,
দেশ থেকে দেশান্তরে । মধ্যাহ্ন দিনের কর্মহীন অলস
শশু মনের নিরঙ্কুশ কল্পনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত । দশাননের
ধা জন্মাত । এক লক্ষ পুত্র ও ততোধিক পৌত্র সংখ্যার
তার যদৃচ্ছ আকাশভ্রমণের ক্ষমতার জন্ত ।

র বৃদ্ধা পিতামহী তাঁর ভক্তি, বিশ্বাস ও সংস্কার
ল গত হয়েছেন । তাঁরই নাতি নাতনীরা যে অদূর
লঙ্কাধিপতির সমকক্ষ হয়ে উঠবে সে কথা কল্পনা
র পক্ষে সম্ভব ছিল না । দণ্ডকারণ্য থেকে স্বর্ণলঙ্কা
কয় দণ্ডে পৌঁছেছিলেন তার উল্লেখ কৃত্তিবাসে আছে কিনা
মনে নেই, কিন্তু কলকাতা থেকে দিল্লী ;—ন'শ' তিন মাইল পথ
আমরা সাত ঘণ্টায় অতিক্রম করেছি । এতে উত্তেজনা আছে, কিন্তু
উপভোগ নেই । কমলালেবুর বদলে 'ভাইটামিন সি' ট্যাবলেট
খাওয়ার মতো ।

প্রাগ্‌বিমান যুগে পথ অতিক্রমণটাই ভ্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য
ছিল না, নানা জনের সংস্পর্শে আসবার একটা সুপারিসর অবকাশ
জাতে মিলতো । মন্দগতি গরুর গাড়ির কথা থাক ; রেল ভ্রমণেও
মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা যোগাযোগ ঘটে বিমানযাত্রায়
তার সম্ভাবনা ত্র নেই । যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষেও বিমান
লাচল বহুলতর হবে । রাত নটায় গ্রেট ইষ্টার্ণে ডিনারের পর
দমদমে প্লেনে উঠে পরিপাটি নিজা দিলে পরদিন সকালে বহুদূর
তাজে ব্রেকফাস্ট খাওয়া যাবে । সেদিন না থাকবে যুব অথবা
যুধির জোরে টিকেট কেনার হাজিমা, না থাকবে কুলীর কলহ বা
সহযাত্রীর কোলাহল । জানালার কাছে 'চা-গ্রাম' হেঁকে কেউ যুম

ভাঙাবে না, পানিপাড়ে তার বালতি থেকে তৃষ্ণাতৃষ্ণ যাক।
ভরে দেবে না এবং টিনের চালার ঘুমটি ঘরের ফটক
পয়েন্টসম্যান সবুজ নিশান দেখিয়ে গাড়ি 'পাশ' করে
দর্শন মিলবে না। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে
কেড়ে নিয়েছে আবেগ। তাতে আছে গতির আনন্দ,
আয়েস।

বিমান ঘাঁটির বাইরে এসে দেখা গেল, যানবাহনের চিহ্নমা-
নেই। বেলা প্রায় দেড়টা। মার্চের রৌদ্রদগ্ধ আকাশ পাণ্ডুর এবং
বাতাস প্রচুর ধূলিকীর্ণ। সামনে এ্যাসফালটমের রাস্তা জনবিরল।
রুম্ম প্রান্তরের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ উল্লস, অধঃ যে-দিকে যতদূর
দৃষ্টি চলে উত্তপ্ত বাতাসের একটা কম্পমান নিঃশ্বাস ছাড়া আর
কিছুই ইন্দ্রিয়গোচর নয়। রুদ্র বৈশাখ কথাটা এতকাল রবি ঠাকুরের
কাব্যে পড়া ছিল; কিন্তু 'লোলুপ চিতাগ্নি শিখা লেহি লেহি বিরাট
অম্বর' বলতে সত্যি যে কী বোঝায় দিল্লীর নিদাঘ মধ্যাহ্নে তার
খানিকটা আভাস পাওয়া গেল। সহযাত্রীদের সাতজন বিদেশীয়।
তাদের খাকী অঙ্গাবরণে যথাযথ সামরিক গোত্রের নিঃসন্দেহ নির্দেশ।
ত্রিপলঢাকা বৃহদাকার এক মোটর লরীতে মাল ও মালিকেরা এক
সঙ্গে বোঝাই হয়ে অন্তর্হিত হলো।

হোটেলে স্থান নির্দিষ্ট ছিল না, সুতরাং গন্তব্যস্থল অজ্ঞাত, প-
অপরিচিত অথচ ভরসা একমাত্র নিজের আদি ও অকৃত্রিম চরণযুগল।
তারই শরণ নিয়ে পথে বিচরণ শুরু করব কিনা ভাবছিলাম।

“আপনি কোথায় যাবেন, চলুন, নামিয়ে দিচ্ছি।”

গভীর রাত্ৰিতে নিশি ডাকে বলেই ত শুনেছি। তবে এ-
দিনেও? না; পিছনে তাকিয়ে দেখি নিজের মোটরের দোর খুলে
দাঁড়িয়ে আছেন একমাত্র বেসামরিক যাত্রাসহচর এ. এস. বোখারি,—
ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠানের ফুয়েরার।

রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নের নিরুপায় পথপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মনে হলো—

স্বয়ং উর্বশী লহ লহ জীবন বল্লভ বলে পায়ে লুটিয়ে পড়লেও বোধ হয় এত খুশি হতেম না ।

সংবাদপত্র ও বেতার জগতে বোথারি সাহেবের নিন্দা ও প্রশংসা দুইই সমপরিমাণ । যদিও সরকারী সুখ্যাতির সোপানে সোপানে, দুর্গম প্রমোশনের শিখরে শিখরে উত্তীর্ণ হয়ে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর তিনি আজ সর্বাধিনায়ক । বেতার-পূর্ব জীবনে তিনি ছিলেন লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক । ছদ্মনামে রসরচনা দ্বারা উর্দু সাহিত্যেও একদা তিনি বহুবিস্তৃত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । ভঙ্গলোক অসাধারণ বাকপটু এবং পরিহাসরসিক । লাওনেল ফিল্ডেন তাঁকে অধ্যাপনার ক্ষেত্র থেকে বেতার জগতে আমদানি করেন । কলেজের লেকচার রুম থেকে রেডিওর স্টুডিও । এদিক দিয়ে বাংলাদেশের শিশির ভাদুড়ীর তিনি সগোত্র । শুধু তিনি একাই নন, তাঁর অনুজ জেড. এ. বোথারিও ফিল্ডেনের অনুগ্রহপ্রচ্ছায় অল ইণ্ডিয়া রেডিওর অঙ্গনে বাসা বেঁধেছিলেন । আশ্চর্য নয় যে, এককালে ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠানের কৌতুক-আখ্যা ছিল ইণ্ডিয়ান বি. বি. সি., —বোথারি ব্রাদার্স কর্পোরেশন ।

নয়াদিল্লীর রাস্তাগুলি নয়নাভিরাম । ঋজু, প্রশস্ত এবং ছায়াচ্ছন্ন । মৃণ্ময় পীচের আস্তরণ, ডাস্টবিন থেকে উপচায়মান জঞ্জালভূপের দ্বারা পঙ্কিল নয় । যানবাহনের সংখ্যা পরিমিত ; পদাতিকদের পক্ষে অনেকটা নিরাপদ । ভারতের অন্যান্য সহরের ত্যায় সত্তত সুধুরমান নির্ভীক বৃষভকুল এখানকার রাজপথে দৃশ্যমান নয় এবং পথপার্শ্বের কোন গৃহের অলিন্দ থেকে অকস্মাৎ তান্মূলরাগ নিরীহ পথচারীদের মস্তকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই । মাঝে মাঝে গোলাকৃতি ক্ষুদ্রাকার পার্ক, সেখান থেকে সাইকেলের চাকার স্পোকের মতো একাধিক পথ নানাদিকে প্রসারিত । পার্কগুলির নাম প্লেস, আকৃতি একই । উইণ্ডসর প্লেসের সঙ্গে ইয়র্ক প্লেসের তফাৎ যা সে শুধু নামে । সবগুলিই সময়ে রচিত এবং রক্ষিত ।

রাস্তার পরিচয় আমলাতান্ত্রিক। সরকারী দপ্তরখানার পূর্বতন বহু ইংরেজ কর্মচারীদের নাম পথের প্রান্তসীমায় সুস্পষ্টাক্ষরে ঘোষিত। মোগল বাদসাহ বাবরের চাইতে চীফ কমিশনার বেলী সাহেবের নামের গুরুত্ব এখানে অধিক। তাই নুরজাহান লেন অপেক্ষা বেয়ার্ড রোড অধিকতর অভিজাত। বোঝা গেল, নয়াদিল্লীর নগরপালদের আর যাই থাক বিনয়ের অপবাদ নেই। প্রসঙ্গতঃ এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, একটি রাস্তার নামকরণ রবীন্দ্রনাথের নামে, তাঁর জীবদ্দশায়ই হয়েছে, কবির জন্মস্থানে আজও যা সম্ভব হয়নি। গাঁয়ের যোগীর পক্ষে ভিখু পাওয়া সত্যি সহজ নয়।

বোথারি সাহেব যেখানে নামিয়ে দিয়ে গেলেন তার নাম কুইনসওয়ে। নামটি ভালো। বাংলা রাণীর দীঘির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু নাম নিয়ে কবিত্ব করার মতো মনের অবস্থা তখন নয়। ক্ষুৎ, পিপাসা ও ক্লান্তি নামক যে ক'টি অসুবিধাজনক অবস্থা মানবদেহকে বিব্রত করে থাকে আপাততঃ তাদের নিরসন প্রয়োজন।

যুদ্ধের হিড়িকে গভর্নমেন্টের দপ্তরখানার বিস্তার ঘটেছে অভাবনীয় বেগে। কেরানী, দপ্তরী, সাহেব সুবোয় সহরের ঘরবাড়ি পরিপূর্ণ। কাঁকা মাঠের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে আছে সেক্রেটারিয়টের বহু তিন-হাজারী, চার-হাজারী মনসবদার। নানা দিগদেশ থেকে এসেছে খবরের কাগজের রিপোর্টার। হোটেল, বোর্ডিং হাউস সর্বত্রই এক রব : ঠাই নাই, ঠাই নাই, ছোট এ বাড়ি। প্রচুর দক্ষিণা কবুল করেও সাতদিনের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় একটা মাথা রাখবার স্থান সংগ্রহ করা গেল না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, বহুদিন মনে ছিল আশা ; রহিব আপন মনে, ধরণীর এক কোণে, ধন নয়, মান নয় একটুকু বাসা। অনুমান হয়, কবি এককালে দিল্লীতে ছিলেন।

যিনি আতিথ্য দিলেন, তিনি একটা বেসরকারী কোম্পানীর স্থানীয় কর্ণধার। নিজের কর্ম কুশলতায় কোম্পানীকে এখানে

দৃষ্টিপাত

সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। নয়াদিল্লী সहरটা সৃষ্টি হয়েছে সরকারী প্রয়োজনে; কপালে তার জয়পত্র আঁটা “অন্ হিজ ম্যাজেস্টি সার্ভিস”। জামসেদপুরকে যদি বলি ষ্টীল-টাউন তবে নয়াদিল্লীকে বলা যেতে পারে ষ্টীলফ্রেমের টাউন। সহরের জনসংখ্যা গড়ে উঠেছে সেক্রেটারিয়টকে কেন্দ্র করে। চাপরাশী, দপ্তরী, কেরানী, সুপারিন্টেন্ডেন্ট-আকীর্ণ এই সহরে বেসরকারী ব্যক্তিদের কল্কে পাওয়া ভার। এখানকার সম্মান ও প্রতিপত্তির উৎস থাকে ইণ্ডিয়া গেজেটের পাতার মধ্যে। যে অল্প সংখ্যক বেসরকারী লোক এখানকার সেক্রেটারী, জয়েন্ট-সেক্রেটারী প্রভাবান্বিত সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন তাঁরা যথার্থই শ্রদ্ধার যোগ্য। আমার হোস্ট সেন মহাশয় স্থানীয় সঙ্কটত্রাণ সমিতির সভাপতি, কালীবাড়ীর সম্পাদক, বাঙালী ক্লাবের কর্মকর্তা এবং আরও একাধিক সাধারণ প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট সদস্য।

ভদ্রলোকের আলমারীতে সারি বাঁধা ‘সবুজপত্রের’ বাঁধানো খণ্ড দেখে বোঝা যায় তাঁর রুচি। ভোজনপর্বে সেটা অধিকতর পরিস্ফুট হলো। শুকতো, ভাজা, ডাল, তরকারী, মাছ, টক, ও একটু দৈ। সাধারণ ভদ্র বাঙালী পরিবারের যা প্রাত্যহিক আহার,—অতিথির জন্তও সেই ব্যবস্থা। অপরাহ্নে নারকেলের কুচি সহযোগে চিঁড়ে ভাজা বা বাড়ীতে তৈরী খানকয়েক লুচি। চায়ের সঙ্গে পাকুয়া রস-গোল্লার সমারোহ এবং ভাতের সঙ্গে চপ কাটলেটের বাছল্য দ্বারা প্রত্যহই অতিথিকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা নেই যে, এ গৃহে সে একজন বহিরাগত আগন্তুক মাত্র। সহজ হওয়ার মধ্যেই আছে কালচারের পরিচয়;—আড়ম্বরের মধ্যে আছে দম্ভের, সে দম্ভ কখনও অর্থের, কখনও বিদ্যার, কখনও বা প্রতিপত্তির।

দুই

কৈল্যেব কাব্যের শ্রীরাধা কৃষ্ণবিরহে একদা ঘর কৈলু বাহির বাহির কৈলু ঘর বলে আক্ষেপ করেছিলেন। দিল্লীর কনট প্লেসকে বৃন্দাবনের কুঞ্জগলি বলে কোন মতেই ভুল করবার সম্ভাবনা নেই, তার পুরনারীরা কেউ বৃষভানুন্দিনী নন। কিন্তু এখানকার শ্রীমতীরাও নিদাঘ রজনীতে ঘরকে বাহির এবং বাহিরকে ঘর করেছেন। না-করে উপায় ছিল না। সমস্ত দিন ধরে মার্ত্তণ্ডদেব এখানে যে প্রচণ্ড কিরণ বিকিরণ করেন, তাতে ঘরের ভিতরটা প্রায় টাটা কোম্পানীর অগ্নিগর্ভ বয়লারের মতো তেতে থাকে। মাথা গুঁজতে গেলে মাথা কুটতে ইচ্ছে হয়। পাখা খুলে দিলেও আগুনের হলুকা লাগে। সুতরাং বাইরে ঘুমানো ছাড়া গতি নেই।

শুধু মেয়েদের নয়, ছেলে বুড়ো বাচ্চা কাচ্চা সবাই এক অবস্থা। সন্ধ্যাবেলা বাড়ির সামনের জমিতে ঘটি ঘটি জল ঢেলে উত্তপ্ত ধরণীকে করা হয় শীতল। তার উপর খাটিয়া বিছিয়ে পড়ে সারি সারি বিছানা। দেখে মনে হয়, যেন সরকারী হাসপাতালের তিন, পাঁচ বা সাত নম্বর ওয়ার্ড। স্বামী, স্ত্রী, শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, ভাজ, পুত্র কন্যা সবাই শুয়েছে উন্মুক্ত আকাশের নীচে। মাথার উপরে নেই আচ্ছাদন, শয্যা ঘিরে নেই কোন আবরণ। অনভ্যস্ত চোখে হঠাৎ যেন একটু দৃষ্টিকটু ঠেকে।

কিন্তু পৃথিবীতে অণু আর পাঁচটা নীতিবোধের জায় আমাদের শালীনতা জ্ঞানটাও আপেক্ষিক। দেশাচারের দ্বারা তার রকমফের ঘটে, প্রয়োজনের খাতিরে হয় রদবদল। কলকাতার বড়বাজারের রাস্তায় দেখা যায়, খাটো কাঁচুলী আর আঠারো গজি ঘাগড়ার মধ্যপথে মেদবহুল দেহের অনেকখানি অনাবৃত রেখে অসঙ্কোচে চলেছেন

মাড়োয়াড়ী মহিলা। আমাদের বাঙালী তরুণীদের মধ্যে কারও মতি হবে না সে সজ্জারীতিতে। হাঁটুর ওপরে ওঠা স্কাট পরে ইংরেজ ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েরা যাচ্ছে যত্র তত্র। কিছু খারাপ লাগছে না তো চোখে। অথচ আমাদের অতি আধুনিকাদের মধ্যেও কোন ছঃসাহসিকা তাঁর ক্রেপ শাড়ীর ঝুল পায়ের গোড়ালী থেকে জানু পর্যন্ত উন্নীত করতে পারবেন না। যদি বা পারেন, লজ্জায় চোখ তুলে তাঁর দিকে কেউ তাকাতে পারবো না।

একই বস্তু কেমন করে শুধু মাত্র আবেষ্টন, ভাষা ও পরিবেশের তফাতে শ্লীল এবং অশ্লীল ঠেকে তার আরও সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আছে সিনেমায়। শিশুর, ভাসুর, পুত্রবধু ও কন্যা-জামাতা একসঙ্গে মেট্রোতে বসে গ্রেটা গার্বো ও চার্লস বোয়ারের দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন আর আলিঙ্গন দেখতে যারা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না, বাংলা ছবির নায়ক-নায়িকার নিরামিষ প্রণয় নিবেদন দৃশ্য তাদেরই অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে দেখেছি। (শারীর তত্ত্বের আলোচনায় যে-কথা বাঙলায় বলতে বাধে ইংরাজীতে তা' নিয়ে গুরুজনের সঙ্গে তর্ক করা হয় অনায়াসে।)

গরমিকালে ঘরে শুলে যে-দেশে জ্বরে ধরে সে-দেশে মেয়ে পুরুষকে বাইরে ঘুমোতেই হয় এবং তিন চারটে করে আলাদা উঠান যখন শতকরা নিরানব্বুই জনের বাড়িতে রাখা সম্ভব নয়, তখন শিশুর, জামাতা, মা ও মেয়ে এক জায়গায় খাট না বিছিয়েই বা করে কী? নয়াদিল্লীটা সার্বজনীন শহর। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কাঞ্চি, কোশল থেকে এখানে ঘটেছে জনসমাগম। আহা! তারা যদি বা নিজ নিজ রুচিকে রেখেছে বজায়; শয়নে মেনে নিয়েছে একই নীতি। পাঞ্জাবী মেয়েদের বসন এ রকম কমিউনিটি স্লিপিংএর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গোড়ালীর কাছে আঁট পায়জামা। শিথিলবন্ধন শাড়ীর মতো অলঙ্কারে নিদ্রিত দেহের উপর অবিচল হওয়ার আশঙ্কা নেই!

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতে যে দৃশ্যটা চোখে পড়লো সে হচ্ছে ফিরিওয়ালার ক্যাভেলকেড্। দুধ, সজী, মাছ, মাংস, ডিম, সবই এখানে ঘরে বসে পাওয়া যায়। পসারিণী যদিও বা নেই, পসরা আসে দরজায়। মাথায় চেপে নয়, গাইকেলে। ঐ জিনিষটা এখানে অসংখ্য। কলকাতায় সাইকেল চাপতে দেখি খবরের কাগজের হকারকে। কিন্তু নয়াদিল্লীতে গয়লা, ধোবা, নাপিত, জেলে, কসাই, ব্লাউজের ছিট, গায়ের সাবান বিক্রেতা আসে সাইকেলের পিছনে মস্ত ঝুরি বা বাস্কেল চাপিয়ে। মহানগরীর সওদাগরেরাও পদাতিক নয়।

প্রভাতে উঠিয়া যে-মুখ দেখিছু, তার বেসাতি দুধ। ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ার মতো হাড়গোড় বেরকরা জীর্ণদেহ সাইকেল, তার পিছনের ক্যারিয়ারে দুপাশে বাঁধা দুধের দুটি টব। টিনের তৈরী, তলায় জলের কলের মতো ট্যাপ, ঘোরালে দুধ বেরোয়। সামনের হাতলে ঝুলছে অনুরূপ গুটি দুই পাত্র। আশ্চর্য বহন ও চলন-ক্ষমতা এই দ্বিচক্রের। আশ্চর্যতর তার চাকা, চেন ও দুধভাণ্ডের সম্মিলিত ঐক্যতানবাদন। টিনের টবগুলির উপরের দিকে ঢাকনি আছে, তাতে তাল। আঁটা। বলা বাহুল্য দুধের বিশুদ্ধতা এবং গয়লার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে ক্রেতাকে আশ্বস্ত করাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু সেটা অসাবধানী লোকের ছাতায় ঘটা করে নাম লেখার মতো। নীরং ত্যক্ত্বা ক্ষীরং গ্রহণ করতে হলে পাঁচ সের দুধকে দু'সেরে দাঁড় করাতে হয়।

গয়লার পরে “কলকাতাকা হিল্শা লো, করাচীকা চিংড়ি” হাঁক দিয়ে এলো মাছওয়াল। বলা বাহুল্য সে ইলিশ বেশীর ভাগই বঙ্গজ নয়, এলাহাবাদের। তবে অনেক মানুষের মতো তারাও চেহারায় সব সময়ে ধরা পড়ে না, পড়ে স্বাদে। মাছওয়ালার সাইকেলের পেছনে ঝুরির উপরে মিহি জালের আবরণ, মাছির অত্যাচার নিবারণের জন্তে। সজীওয়াল আসে একে একে। কেউ হাঁকে সেউকী লো, কেউ হাঁকে পালং অথবা গোবী। কারো বা

বুড়িতে আছে টিমাটো, ভিণ্ডি, হরা ধনিয়া এবং সীতা ফল অর্থাৎ কুমড়া। রজক বাইসিকেলের পশ্চাতে যে পর্বত প্রমাণ কাপড়ের বোঝা চাপিয়ে আসে তা দেখে ত্রেতাযুগের পবননন্দনেরও বিস্ময়ের উদ্ভেক হতে পারতো।

মেয়েদের চুল ও ছেলেদের দাড়ি দুয়েরই প্রসাধন-প্রয়োজন সমান সময় সাপেক্ষ। তফাৎ শুধু এই যে প্রথমটির যত্ন বুদ্ধিতে, দ্বিতীয়টির বিনাশে। চুল রোজ বাঁধতে হয়, দাড়ি রোজ কামাতে। যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে এবং যে আপিস করে সে ক্ষুরও চালায়,—এ কথা সত্য। তবুও বেগীরচনায় ভ্রাতৃজায়া বা ননদিনীর সহায়তা পেলে মেয়েরা খুশি হন; ক্ষৌরকার্যে নরসুন্দরের সাহায্য পেলে অনেক ছেলেরা আয়েস বোধ করে। তাই সকাল আটটা থেকে দ্বারে দ্বারে হানা দেয় হাজাম। তার সঙ্গে আছে খুব ছোট পিতলের একটি পোর্টেবল চুল্লী, অনেকটা ইকমিক কুকারের মত আকৃতি। তাতে শীতের দিনে সর্বদা জল গরম হয়। শীতের দেশের বাসিন্দারা জানেন, ডিসেম্বরের ৩৭ ডিগ্রির শীতে গালে ঠাণ্ডা জল দেওয়ার চাইতে চড় দেওয়া ভালো।

সাড়ে নটা থেকে শুরু হয় আপিস-অভিযান। প্রথমে চাপরাশী-দল। গায়ে খাঁকী রংএর উর্দি, মাথায় পাগড়ী ও কটিতে লাল সর্পাকৃতি তিন চার ফেরতা কোমরবন্ধ। দু একজনের কোমরবন্ধে সুদৃশ্য খাপের মধ্যে হাতের দাঁতের বাটওয়ালা ক্ষুদ্র ছুরিকা। মোগল বাদশাহের আমলের খোজা প্রহরীদের অনুকরণ। তারা অনারেবল মেম্বর বা সেক্রেটারীদের চাপরাশী। আর্দালী বাহিনীতে মেজর জেনারেল। তাদের সাইকেলের পিছনে লাল খেরো কাপড়ে বাঁধা এক গুচ্ছ ফাইল, যা সাহেবরা প্রত্যেক শনিবারই বাড়ি নিয়ে যান কাজ করার জন্তে এবং বেশীর ভাগই সোমবারে ফিরিয়ে আনেন একবারও না ছুঁয়ে।

চাপরাশীদের পরে যায় কেরানী, এ্যাসিস্ট্যান্ট ও সুপারিন্টেন্ডেন্টরা

সাইকেল, সাইকেল, সাইকেলের পরে সাইকেল। ঠিক যেন একটা সাইকেলের প্রসেশন। তার সঙ্গে আছে টাঙ্গা। সেও দ্বিচক্রযান। ঘোড়ায় টানে। সামনে ও পিছনে চারজন বসা যায়,—কিন্তু মুখোমুখি নয়, পিঠোপিঠি। মাথার উপরে সামান্য একটু ক্যান্ডিসের আচ্ছাদন; তাতে রৌদ্রতাপ বা বৃষ্টিধারা কোনটাই পুরোপুরি নিবারিত হয় না। আরোহন ও অবরোহনের কালে পুরুষদের পক্ষে হয় জিম্ন্যাস্টিকের পরীক্ষা, শাড়ীপরিহিতাদের পক্ষে ভব্যতার। একটু সতর্কতার অভাবেই পতন ও মূর্ছা অসম্ভব নয়।

টাঙ্গার গতি মন্থর, আসন আরামহীন এবং পরিবেশ নাসারক্তের পক্ষে ক্লেশকর। সম্প্রতি আমেরিকানদের দাক্ষিণ্যে দক্ষিণার হার হয়েছে বৃদ্ধি। আগে যে রাস্তাটুকুর মাশুল ছিল চার আনা, তার জন্য এখন বারো আনার কমে টাঙ্গাওয়ালারা কথাই বলে না, কিম্বা এমন কিছু বলে যা না শোনাই ভালো। তবে দশটা পাঁচটায় সেক্রেটারিয়টের পথে সহযাত্রী মেলে। টাঙ্গাওয়ালা “দপ্তরকো, দপ্তর যানোবালা আইয়ে” বলে চেষ্টা করে সংগ্রহ করে সওয়ারী। তাতে ভাড়ার অংশ বিভক্ত হয়ে পকেটের পক্ষে সুসহ হয়। ভাগের মা গঙ্গা পায় না; কিন্তু ভাগের টাঙ্গা গন্তব্যস্থল অবধি গিয়ে পৌঁছয়।

সাড়ে দশটার মধ্যে গোটা শহরটার সমস্ত পুরুষেরা নিষ্ক্রান্ত হলো পথে। সব পথের একই লক্ষ্য—সেক্রেটারিয়ট। বাবু পালানো পাড়া জুড়ালো, গিন্নি এলো পাটে।

ইম্পিরিয়ল সেক্রেটারিয়টটি নবনির্মিত। শুধু সেক্রেটারিয়ট নয়, এখানকার বাড়িঘর, পথঘাট, হাটবাজার সবই নতুন। নয়াদিল্লী শহরটা আপস্টার্ট; বারাণসী, প্রয়াগ, এমন কি কলকাতা মুর্শিদাবাদের মতোও এর পশ্চাতে কোন ট্র্যাডিশন নেই। সে হঠাৎ-টাকা-করা ওয়ার কন্ট্রাক্টর, সাত পুরুষের বনেদি জমিদার নয়। কিন্তু যুগটাই যে ভুঁইফোড়দের। এযুগে জুড়ি গাড়ির চাইতে বেবী-অস্টিন, সাত

লহরীর চাইতে মফ্‌চেন এবং খেয়াল গান অপেক্ষা গজলের আদর বেশী। বিত্ত হলেই হলো, নাই বা রইল বৈভব।

মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত পথ কিংসওয়ে, ভাইসরয়'স হাউসের লৌহদ্বার অবধি প্রসারিত। তারই দু'পাশে সেক্রেটারিয়টের দুই মহলা,—নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লক। আকৃতি, রং, রেখা, গঠনভঙ্গি ভুবল্ল এক। যেন ময়রার দোকানে 'আবার খাবো' বা জলতরঙ্গ ছাঁচে গড়া এক এক জোড়া সন্দেশ। নর্থ ব্লকের সিঁড়ির মাথায় প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ পরিকল্পনাকার সার হার্বাট বেকারের নাম।

নয়াদিল্লীর প্রায় সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী বাড়িগুলিই মুখ্যতঃ ক্লাসিক্যাল অর্থাৎ গ্রীক স্থাপত্যের অনুকরণ, যদিও পুরোপুরি নয়। থাম আর গম্বুজ। আর্চের সংখ্যা কম। যা' আছে তাও রোমান ধরণের অর্ধবৃত্তাকার, মুসলিম পদ্ধতির সূক্ষ্মগ্রভাগের নয়। থামগুলি চতুষ্কোণ নয়, গোলাকার। নয়াদিল্লীর পত্তনে গ্রীক স্থাপত্যকে গ্রহণের পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য ছিল কিনা বলা শক্ত। তবে কোন কোন বিশেষজ্ঞের ধারণা এই যে, জলবায়ু ও আবহাওয়ার দিক দিয়ে গ্রীস উত্তর ভারতের সমতুল্য, যদিও তার গ্রীষ্ম অপেক্ষাকৃত সহনযোগ্য এবং শীত অপেক্ষাকৃত কঠোরতর। উত্তর ভারতের মতো গ্রীসেরও বাতাস অনার্দ্র, আকাশ নির্মেষ এবং রৌদ্র নির্মল। সুতরাং গ্রীক স্থাপত্য নয়াদিল্লীর পক্ষে স্থায়িত্বের দিক দিয়ে অধিকতর উপযোগী হবে, স্থপতিদের মনে এ বিশ্বাস দেখা দেওয়া আশ্চর্য নয়।

কিন্তু নয়াদিল্লীর স্থাপত্যকে পুরোপুরি কোন একটা বিশেষ সংজ্ঞা দেওয়া ঠিক নয়। সেটা ক্লাসিক্যাল বটে কিন্তু একেবারে নির্ভেজাল নয় সেক্রেটারিয়ট দালানে হিন্দু পদ্ধতিরও চিহ্ন আছে—সারনাথে দৃষ্ট অশোকস্তম্ভের অনুকরণে গঠিত স্তম্ভগুলিতে। আছে প্রবেশ তোরণ ও অন্যান্য অংশে হস্তী, ঘণ্টা প্রভৃতি অলঙ্করণে। তারই সঙ্গে আছে মুসলিম স্থাপত্য রীতির পাথরের জালি, ফতেপুর সিক্রিতে চিত্তির কবরে যার বহুল নিদর্শন। রাঙ্গমিস্ত্রিরা বেশীর

ভাগই এসেছে জয়পুর, রাজপুতানার অন্যান্য স্থান এবং আগ্রা থেকে। জনশ্রুতি এই যে, তাদের মধ্যে অনেকে ছিল তাজ নির্মাতাদের উত্তরপুরুষ। নর্থ এবং সাউথ, দু' ব্লকেরই মাথায় বিরাট গম্বুজ, অনেকটা রোমের সেন্ট পল গির্জার অনুরূপ, যদিও এতে কিছুটা মুসলিম স্থাপত্যের ছাপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। চোখে দেখে মনে হয় না যে গম্বুজ দুটির উচ্চতা কুতুবশীর্ষ থেকে মাত্র ২১ ফুট কম। দুটি ব্লকে মিলিয়ে সেক্রেটারিয়টে কক্ষ আছে প্রায় ১ হাজার, সব ক'টি মিলিয়ে বারান্দার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় আট মাইল। এলাহী কাণ্ডই বটে।

সাধারণতঃ সরকারী দপ্তরখানাটার সঙ্গে আর্টের বড় একটা সম্পর্ক থাকে না। তার নামে যে দৃশ্যটি আমাদের কল্পনায় আসে তা' এক রাশি নথী, দলিল, দস্তাবেজ ও হিসাব নিকাষ। দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত টেবিলের উপর ফাইল ঘাঁটাই যেখানে একমাত্র কাজ সেখানে গৃহের গঠনভঙ্গি বা পরিবেশ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনে। সে দালানের জানালা কী ঢংএর বা সিঁড়ি কাঁ ঢংএর সে প্রশ্ন আমাদের মনেই আসে না। পুলিশ কোর্টের দেয়ালে অজস্তার ফ্রেস্কো পেন্টিং আমরা আশা করিনে। কিন্তু দেখলে খুশি হতেম না? অন্ততঃ নয়াদিল্লীর সেক্রেটারিয়টকে সুদৃশ্য করার চেষ্টা দেখে আনন্দিত হয়েছি।

লাল পাথরে গড়া বিরাট ভবন। মাঝখান দিয়ে দূরপ্রসারিত পথ। পথের দুপাশে শ্যামল দুর্বার আস্তরণে ঢাকা বিস্তৃত প্রাঙ্গন। মাঝে মাঝে কৃত্রিম ঝিল, তাতে সারিবন্দী ফোয়ারা থেকে অবিরাম উৎসারিত হচ্ছে জলরাশি। পাশে পুষ্পিত মরশুমী ফুলের,—ডেজী, প্যানসী, এ্যাষ্টর ও হলি-হকের কেয়ারী। নির্বাচিত স্থানে একটি করে কমলালেবুর গাছ। বর্ষ-যত্নে বৃত্তাকারে ছাঁটা তার ডালপালা, মনে হয় যেন বাঁটের উপর খোলা দাঁড়িয়ে আছে এক একটি ছাতা।

দালানের ভিতরটাকেও কেবলমাত্র কাজের উপযোগী না করে

দর্শনযোগ্য করার প্রয়াস আছে। নর্থ ও সাউথ ব্লকে কমিটি রুম নামক যে বৃহৎ কক্ষগুলি আছে তার সিলিং এবং দেয়াল চিত্রশোভিত। বসে স্কুল অব আর্টের শিল্পীদের আঁকা। চিত্রগুলির বিষয়বস্তু ভালো কিন্তু দুঃখের বিষয় অঙ্কন চাতুর্য প্রশংসনীয় নয়। এই কক্ষগুলিতে নানা রকম কমিটি, কনফারেন্স বসে। সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের প্রথম প্রেস কনফারেন্সও বসল সাউথ ব্লকের কমিটি রুমে।

ক্রীপসের বিমান নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে এসে পৌঁছল দিল্লীতে, বেলা তখন দুটো। সুতরাং বেলা চারটায়,—মাত্র দু' ঘণ্টার ব্যবধানে,—একটা প্রেস কনফারেন্স ডাকার মধ্যে তৎপরতার পরিচয় আছে যথেষ্ট। সাউথ ব্লকের সবটাই মিলিটারীর দখলে, বেসামরিক দপ্তরের মধ্যে মাত্র হোম ডিপার্টমেন্ট আছে একটি টেরে। অবস্থান নৈকট্যের কারণ বোধ হয় স্বভাবসাদৃশ্য। ভারতে পুলিশ আর মিলিটারী প্রায় কাছাকাছি। সগোত্র না হলেও স্বজাতি বটে।

দরজায় কড়া সামরিক পাহারা। সাংবাদিক ও রিপোর্টারদের জন্য ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে ব্যবস্থা হয়েছে প্রবেশপত্রের।

প্রচুর বকশিশ ও প্রচুরতর তাড়না দ্বারা টাঙ্গাওয়ালাকে উৎসাহিত করা সহজে সাউথ ব্লকের দরজায় এসে যখন অবতীর্ণ হলেম, চারটে বাজতে তখন মিনিট খানেক মাত্র বাকী। বেচারার চেষ্ঠার ক্রটি ছিল না। কিন্তু টাঙ্গার ঘোড়াগুলি ভারতীয় যোগীপুরুষদের মতো নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত ও নির্বিকার; কোন কিছুতেই তাদের উত্তেজিত করা সহজ নয়, বেগবৃদ্ধি প্রায় সাধ্যাতীত। উদ্বিগ্নাসে রওনা হলেম কনফারেন্স কক্ষের উদ্দেশ্যে। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন সপারিসদ সার ফ্রেডরিক পাকুল্, ইনফরমেশন বিভাগের কর্ণধার। পরিচিত বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে বললেন ক্রীপসের অপেক্ষা করছেন। গোটা দুই সিঁড়ি উপরে যাচ্ছিলেন একটি শ্বেতাঙ্গ, মনে হলো সত্য আগত ইংরেজ বা মার্কিন রিপোর্টারদের অন্যতম। হঠাৎ পিছিয়ে

নেমে এসে সার ফ্রেডারিককে জিজ্ঞাসা করলেন, “Did you say Cripps ? That’s me.”

এর চেয়ে বজ্রপাত হওয়া ভালো ছিল।

আমরা বিস্মিত, পাকুল স্তম্ভিত, পারিষদেরা হতবাক।

সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ওয়ার ক্যাবিনেটের সদস্য। ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারণ করতে এসেছেন ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার প্রস্তাব নিয়ে। আছেন ভাইসরয়ের প্রাসাদে। সুতরাং প্রেস কনফারেন্সে আসবেন বড়লাটের ক্রাউন মার্ক গাড়ি চেপে, আগে চলবে লাল মোটর সাইকেলে পাইলট সার্জেন্ট, পাশে থাকবে ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী বা অনুরূপ কোন হোমরা চোমরা পথ প্রদর্শক। জমকে, জৌলুসে চিনতে বিলম্ব হবে না এক মুহূর্ত। এইটেই আশা করছে সবাই। হা হতোস্মি; কোথায় প্রাইভেট সেক্রেটারী আর কোথায় বা আগে পিছনে পিস্তলকোমরে সার্জেন্ট পাহারা। সঙ্গে একটি মাত্র ভাইসরয়’স হাউসের চাপরাশী, বোধ করি সেও শুধু পথ চিনিয়ে দেওয়ার জন্য।

সরকারী কায়দা কানুন, ফর্মালিটি পরিহার করে আড়ম্বরহীন, সহজ ও সরল একটি পরিবেষ্টন সৃষ্টি করলেন ক্রীপস। তাঁর আন্তরিকতায় ভারতবর্ষের আস্থা গভীরতর হলো, তাঁর চেষ্টার সাফল্য কামনা করলো জনসাধারণ, তাঁর সুখ্যাতি অকুপণ ভাষায় কীর্তিত হলো। সর্ব প্রদেশ ও সর্ব ভাষায় বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে।

কনফারেন্সে ক্রীপস আবেদন জানাচ্ছেন সাংবাদিকদের, তাঁরা যেন ক্রীপস প্রস্তাবের সার মর্ম নিয়ে অযথা গবেষণা না করেন। নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনার পূর্বে সংবাদপত্রে মীমাংসা প্রস্তাবের কল্পিত বিবরণ প্রকাশের দ্বারা যেন অবাঞ্ছিত বিরুদ্ধভাবের সৃষ্টি না হয় রাজনীতিক মহলে। বলা বাহুল্য, সে আবেদনের প্রয়োজন ছিল।

সব চেয়ে বিস্ময়কর, প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্রীপসের মনে

অবিচলিত আস্থা। ওয়ার ক্যাবিনেটের সর্বসম্মত এই মীমাংসা প্রস্তাব ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে অনায়াসে গ্রহণীয় হবে, ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের বিরোধ অপনীত হবে এবং দীর্ঘকাল ধরে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার যে অদম্য অভিলাষে ভারতের অগণিত নরনারী ছুরুহ ত্যাগ ও ঝুংসহ নির্যাতন বরণ করেছে তার সার্থক পরিণতি ঘটবে, এ বিষয়ে ক্রীপসের মনে সংশয়ের লেশমাত্র ছিল না। ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী চার্চিলের মনোভাব কারো অজ্ঞাত নয়। জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষের প্রতি ক্রীপসের সহানুভূতি, বিশেষ করে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দও তেমনি অতি পরিচিত তথ্য। চার্চিল ইম্পিরিয়লিষ্টদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রক্ষণশীল। ক্রীপস সোশ্যালিষ্ট গোষ্ঠীতেও সব চেয়ে প্রগতিশীল। জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন,—এই সর্ববাদিসম্মত প্রস্তাব রচনায় প্রধানমন্ত্রী ও সার স্ট্যাফোর্ডের মতৈক্য হলো কী করে? চার্চিল তাঁর মতবাদ ত্যাগ করেছেন, না কি সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস বদলেছেন?

প্রবল হাস্তরোলের মধ্যে ক্রীপস উত্তর করলেন, কোনটাই নয়, ছ'জনারই মতের মিল হওয়ার মতো একটা নতুন পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে, যা' এর আগে চোখে পড়েনি।

কনফারেন্স থেকে যখন বাইরে এলেম ঘড়ির কাঁটা তখন প্রায় ছ'টার কোঠায়। অপরাহ্ন বেলার শান্তরোষ সূর্যের রশ্মি পড়েছে সেক্রেটারিয়ট ভবনের রক্তাভ প্রাচীরে। সামনের ফোয়ারার উৎসারিত জল কম্পিত ধারায় বিক্ষিপ্ত হচ্ছে বৃত্তাকার প্রস্তর আধারে। ঋজু, দীর্ঘ কিংসওয়ার প্রান্তভাগে দেখা যায় ওয়ার-মেমোরিয়েল, বিগত মহাযুদ্ধে নিহত ভারতীয় সৈন্যদের স্মরণলেখা যার গায়ে উৎকীর্ণ। দূরে ইন্দ্রপ্রস্থের পাষাণ দুর্গের ভগ্নাবশেষ রূপসী তরুণীর পাশে পলিতকেশ, বিগতযৌবনা বৃদ্ধা পিতামহীর মতো নয়াদিল্লীর বর্তমান বৈভবকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে কালের অমোঘ বিধান, অপ্রতিরোধ্যনীয় পরিণাম।

পিছনে তাকিয়ে দেখি উন্নতশির ভাইসরয়'স হাউসের বিরাট গম্বুজের শীর্ষে বাতাসে মৃদু আন্দোলিত ইউনিয়ন জ্যাক,—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সনাতন গৌরবচিহ্ন। দু'শ বছর ধরে ভারতবর্ষে রয়েছে অচল, অটল ও অনপন্যেয়। এইমাত্র যে-কনফারেন্স শেষ হলো, তাতে আশ্বাস ছিল ঐ পতাকার বর্ণ পরিবর্তনের। সে বর্ণ গৈরিক হবে কি সবুজ হবে, তাতে চরকা থাকবে কি অর্ধ চন্দ্র থাকবে সে-প্রশ্ন পরের। আপাততঃ এইটিই বড় কথা যে, সে নতুন হবে, ভারতীয় হবে। কিন্তু সে কবে গো, কবে ?

তিন

গৃহকর্তার সাত বছরের মেয়ে রেবা এসে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করল, “মিনি সাহেব, ইংরেজ জিতবে কি জাপান জিতবে?”

মিনি সাহেব নামের পিছনে আছে ইতিহাস। শুধু ইতিহাস নয়, ভাষাতত্ত্বও।

বিলাতে গেলে আমাদের প্রথম রূপান্তর ঘটে বেশে, দ্বিতীয় নামে। দেশে থাকতে যারা পল্টু, গদাই, সুরেন কিম্বা সুবোধ, বিদেশে তারাই সেন, রয়, মিটার অথবা ব্যানার্জী। নয়া দিল্লীটা খাঁটি বিলাত নয়, এরসাৎস্। এখানেও ব্যক্তির পরিচয় নামের আদিত্যে নয়, অস্তিত্বে। পি. এল. আস্থানার আট অক্ষর দুটি কিসের সংক্ষেপ তা নিয়ে কারও ঔৎসুক্য নেই, শেষেরটুকু জানলেই হলো। পদমর্যাদার উপরে নির্ভর করে সম্বোধনের বিশেষণ। কেরাণী হলে আস্থানার সাফিক্স বসে বাবু, অফিসার হলে প্রেফিক্স লাগে মিস্টার।

কিন্তু মুখে মুখে কথার ধারা বদল হয়, নামেরও পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে চাকর, বেয়ারা, আদালী, পিওনের অশিক্ষিত উচ্চারণে অনেক সময়ে চলতি বিকৃতি থেকে আসল আকৃতি আঁচ করাই কঠিন হয়। ব্যানার্জী বেনারসী হন, মিঃ ম্যাকার্টিস হন মারকুটি সাহেব। সেনগৃহের পরিচারিকা বিলাসিয়ার আদি বাস রামগিরি পর্বতের সান্নিদেশে। ভাষা কিছুটা ড্রাবিড় এবং কিছুটা আর্য, উচ্চারণ মারাত্মক। সুতরাং কবে কেমন করে কোন্ শব্দের অপভ্রংশ ও কোন্ শব্দের অর্ধাংশ মিলিয়ে তার মুখে মিনি সাহেবে দাঁড়িয়ে গেছি সে গবেষণায় সুনীতি চাটুর্ঘ্যের শরণ নিতে হবে।

“বল না, মিনি সাহেব, কে জিতবে। ইংরেজ না জাপান?” প্রশ্নকর্তী তাড়া দিলেন।

প্রশ্নটা নূতন নয়। ইতিপূর্বে আরও অনেকের কাছে শুনতে হয়েছে এ জিজ্ঞাসা। জবাব অবশ্য দিতে হয়নি। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশ্নকারী নিজেই দিয়েছেন উত্তর, চেয়েছেন শুধু সমর্থন। যারা তা দেন নি, তাঁরাও কী শুনলে খুসী হবেন সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশমাত্র রাখেন নি কখনও, ঠিক যেমন শ্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন নতুন শাড়ীটায় তাকে কেমন দেখাচ্ছে। সুতরাং পাল্টা প্রশ্ন করলেম, “তুমি বল, কে জিতবে।”

“ইংরেজ!” স্বর গম্ভীর, প্রত্যয়ব্যঞ্জক। স্বয়ং চার্চিলের পক্ষেও বোধ হয় এতটা নিশ্চিত উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু প্রতিপক্ষ কাছেই ছিল। বোনের উত্তর কানে যেতেই ভাই ছুটে এল! “কী বললি? ইংরেজ জিতবে? জিতবে না হাতি। জাপানীদের সঙ্গে পারবে ইংরেজ? ফুঃ!” বাক্যের সঙ্গে যোগ করল ভঙ্গি। ঠোট বাঁকিয়ে মুখে চোখে এমন একটা গম্ভীর তাকিল্যের ভাব প্রকাশ করল যাতে শ্রোতাদের পক্ষে ইংরেজের জয় সম্পর্কে ক্ষীণতম আশা পোষণ করাও হাস্যকর নিবুদ্ধিতা বলে গণ্য হবে।

বুড়ু রেবার চাইতে মাত্র দু’ বছরের বড়। কিন্তু অভিভাবকত্বের ধারা প্রায়ই বয়সের অনুপাত মেনে চলে না। বিশেষতঃ বুড়ু স্কুলে ভর্তি হয়েছে, রেবার এখনও বাকী। সুতরাং তর্ক বিতর্কের মাঝপথে বুড়ু যখন থার্ড মাস্টার বা অন্য ছাত্রদের নজীর উল্লেখ করে, রেবাকে তখন বাধ্য হয়েই বোবা হতে হয়। “বিশু আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়, সে বলেছে। তার চাইতে তুমি বেশী জান কি না?” এ যুক্তির উপরে আর তর্ক চলে না।

কিন্তু আজতো ফার্স্ট বয়ের মতামত নয়। এ যে তার নিজের বিশ্বাস। তাই রেবা দমল না।

“কেন জিতবে না, ঠিক জিতবে।” কিন্তু কণ্ঠে যেন সে দৃঢ়তার আভাস পাওয়া গেল না।

বুড়ু অপরিসীম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, “ইংরেজ জার্মানির সঙ্গেই পারে না, আর পারবে জাপানের সঙ্গে। হেরে ভূত হয়ে যাবে।”

“কেন হারবে? ইংরেজের কত কামান বন্দুক কত এরোপ্লেন। আছে জাপানীদের এরোপ্লেন?”

“জাপানীদের এরোপ্লেন নেই? হা হা হা! এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলে ইংরেজের রিপালস্ আর প্রিন্স অব ওয়েলস ডুবিয়ে দিল কে শুনি? পারল ইংরেজ জাপানীদের কিছু করতে? ইংরেজের এরোপ্লেন তো সব ভাঙা, কী হয় তা দিয়ে।”

“ইংরেজের এরোপ্লেন ভাঙা, মিনি সাহেব? ভাঙা যদি তবে আকাশে ওঠে কেমন করে?” করুণ কণ্ঠে আপীল জানালেন ইংরেজ-হিতাকাঙ্ক্ষী।

কিন্তু আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই বুড়ু বলল, “ওঠে আর পড়ে যায়। কাল পত্রিকায় লেখেনি বিমান দুর্ঘটনা? কলকাতায় এরোপ্লেন আকাশে উড়তে গিয়ে পড়ে গেছে। তাতে মানুষ মরেছে।”

অকাট্য প্রমাণ। শুধু ঘটনা নয়, একেবারে দিন তারিখ পর্যন্ত উল্লেখ। এর পরে তর্ক করা কঠিন। তবুও শেষ চেষ্টা হিসাবে ক্ষীণ প্রতিবাদ করল রেবা। “দেখো ইংরেজ হারবে না।”

“তুমি কত জানো! হারবে, হারবে, হারবে। জাপানীরা চার্চিলকে হাতে পায়ে বেড়ী দিয়ে বেঁধে এনে তার পর ক্ষুর দিয়ে গলা কাটবে।” বলে এমন বীরদর্পে প্রস্থান করল বুড়ু যেন জাপানী নয়, সে নিজেই চার্চিলের বন্ধনের উদ্যোগ করতে গেল।

রেবা প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল, “কখনও নয়, জাপানীরা পারবে না। পারবে মিনি সাহেব?”

তাকে কাছে টেনে আদর করে বললেন, “না, পারবে না। আর পারলেই বা কী? বাঁধুক না চার্চিলকে; আমাদের রেবা দিদিমণিকে তো আর বাঁধতে পারছে না।”

“ইংরেজ হেরে গেলে বিলদের কী হবে? বিলের বাবাকে ধরে

নিয়ে যাবে, মাকে নিয়ে যাবে, জন, লুসী ও এ্যানি সবাইকে তো বেঁধে নেবে ?” বিল মানে প্রতিবেশী উইলিয়ম। রেবাদের পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা সিমস্ দম্পতির বারো বছরের ছেলে জন। লুসী ও এ্যানি তারই দুই বোন।

“তা নিক না ধরে বিলদের। ওদের ট্যাবী কুকুরটা আমাদের বিলাসিয়াকে সেদিন কামড়ে দিচ্ছিল যে।”

মাথা নেড়ে প্রবল আপত্তি প্রকাশ করল রেবা। বলল, “না, ধরে নেবেনা ওদের। বিল আমাকে চকোলেট দেয়, টফী দেয়। বলেছে একদিন তার সাইকেলে চড়তে দেবে।”

ও হরি! এতক্ষণে ব্রিটেনবান্ধবীর প্রবল ইংরেজ-হিতৈষণার আসল কারণটা বোঝা গেল। চকোলেট, টফী, তার উপরে আবার সাইকেল চড়তে দেওয়ার আশ্বাস। এর পরেও ইংরেজের পরাজয় কল্পনা করা অত্যন্ত কৃতঘ্নতার পরিচয় হবে। বিশ্বয়ের কিছুই নেই। ভারতবর্ষে ইংরেজ অনুরাগী যে কজন আছেন তাঁদের সবারই ঐ এক অবস্থা। চকোলেট, টফী না হোক, কারো চাকুরী, কারো প্রমোশন, কারোবা রায় সাহেব, খান বাহাদুর বা সি. আই. ই, নাইটহুড খেতাব।

কিন্তু সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধ প্রসঙ্গে বাধা পড়ল। সম্ভ্রীক ঘোষ সাহেব হানা দিলেন। এই দম্পতীটির সঙ্গে আলাপ হয়েছে মাত্র দিন কয়েক। কিন্তু তাদের আন্তরিকতা অল্পকালের মধ্যেই অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি করেছে। মিসেস বললেন, “চলুন ওখলায়।”

“সে কোথায়? পেরু না কামস্কাটিকায়?”

“তার চাইতে কিছুটা কাছে। মথুরার পথে, এখান থেকে মাইল আটেক। ফিরতি পথে নিজামুদ্দিন দেখিয়ে আনব।”

ওখলা জায়গাটা একটা দ্বীপের মতো। যমুনার ধারাকে একটি কৃত্রিম খালের মধ্য দিয়ে ভিন্নমুখী করা হয়েছে সেখানে। সে খাল বেষ্টিত করেছে এক টুকরো ভূমিখণ্ড। বৃক্ষবহুল, ছায়াচ্ছন্ন। একপাশে সরকারী সেচ বিভাগের দপ্তর, বাকীটা প্রমোদ-উদ্যান। খালের



মুখ খোলা ও বন্ধ করার জন্ত আছে লকগেট, তার উপরে প্রশস্ত সেতু। টাঙ্গা ও মোটর অনায়াসে যেতে পারে। ছুটির দিনে দলে দলে লোক আসে পিকনিক করতে। ওখলা নয়াদিল্লীর বটানিকস্।

স্থানটি মনোরম। চারদিকের ধূসর রুক্ষ ও ধূলিকর্ণ দেশে একটুখানি স্নিগ্ধ, শ্যামলতার আমেজ মেলে। যমুনার অগভীর প্রবাহ খালের দিকে প্রসারিত করার জন্ত দীর্ঘ বাঁধ। তার উপর দিয়ে উপচীযমান শুভ্র জলধারা গড়িয়ে পড়ছে ওপাশে। বেদীর মতো পাথর দিয়ে বাঁধানো সেখানটা। চাষীদের ছেলেরা কাপড় দিয়ে মাছ ধরায় ব্যস্ত। খালের মুখে ছিপ ফেলে বসে আছেন দু' একজন সাহেব ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাঁদের ধৈর্য বিপুল এবং আশা সীমাহীন। গাছের নীচে ফরাস বিছিয়ে বসেছেন কোন শেঠ, প্রসাদ বা গুপ্তজী। চৌরী বাজারে বিরাট লোহার আড়ৎ। সারা সপ্তাহ হন্দর হিসাবে লোহা বেচে অর্থ উপায় করেছেন প্রচুর। রবিবারে এসেছেন প্রমোদ-ভ্রমণে। সঙ্গে এসেছে বিপুলকায়া গৃহিনী, আধ ডজন পুত্রকন্যা, গোটা চারেক বৃহদাকার টিফিন কেরিয়ার, জলের সোরাই, আলবোলা ও ভূত্য।)

এসেছে কাঁধের উপরে পিতলের চাক্তী বসানো খাকী গায়ে ইংরেজ, ক্যানাডিয়ান বা অষ্ট্রেলিয়ান ক্যাপ্টেন। (বালুসংলগ্না ফিরিঙ্গী বান্ধবী। স্বন্ধে চামড়ার ফিতে দিয়ে লম্বমান ফটোগ্রাফের ক্যামেরা। প্রকাশ্য দিবালোকে তাদের প্রণয়কাণ্ডের উৎকট আতিশয্য দেখে মাঝে মাঝে লজ্জিত হতে হয় দর্শকদেরই।)

স্বদেশে ইংরেজকে কখনও দেখিনি এমন মাত্রাজ্ঞানহীন। শনিবার বিকেলে পিকাডিলীতে দেখেছি প্রণয়ীযুগলের দল। কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে। তাদের আনন্দোচ্ছ্বাস ঠিক ভট্টপল্লীর বিধানানুযায়ী নয় বটে, কিন্তু তবুও অদৃশ্য, অলিখিত একটা রেখা টানা আছে যা' লজ্জন করে না কেউ। সে-রেখা সুনীতির নয়, শূন্যচির। ডিসেন্সীকে ইংরেজ ভালবাসে মনে প্রাণে। ইন্ডিসেন্ট

বলার বাড়ী গাল নেই ইংলণ্ডে। ছাব্বিশ মাইল জল পার হলেই কন্টিনেন্টে দেখা যায় না এ রুচিবোধ। শালীনতার অঙ্গুলি নির্দেশকে সেখানে তরুণ তরুণীরা বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায় অকুণ্ঠিত চিত্তে।

সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এদেশে এসেছে যে-ইংরেজ, সে ঐ সুরুচির রেখাটার কথা ভুলে গেছে নিঃশেষে। বৃটেনের বাইরে বৃটিশ কলঙ্কের কদর্য কাহিনী আছে Somerset Maugham এর গল্পে ভুরি ভুরি। পালামো ভ্রমণে সঞ্জীবচন্দ্র এক জায়গায় লিখেছেন, শিশু সুন্দর মায়ের কোলে, পশু সুন্দর জঙ্গলে। বৃটেন-জঙ্গলের বাইরে ইংরেজকে দেখলে সংশয়ের অবকাশ থাকে না ডারুইন তত্ত্বে।

ভারতবর্ষে ইংরেজের এই নির্লজ্জ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রধান কারণ এই যে, চার পাশের দর্শকদের ওরা মানুষ বলেই গণ্য করে না। আমরা ওদের সম্বন্ধে কী ভাবি না ভাবি তা নিয়ে ওদের কোন মাথাব্যথা নেই, নেই আমাদের সামনে ভদ্র আচরণের দায়িত্ব। আরও একটা কারণ আছে, সেটা গভীরতর। এদেশে ইংরেজ তার পরিবার ও সমাজ থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এখানে সে বল্গাহীন অশ্ব। সে যেন কলকাতার মেসে-থাকা মফঃস্বলের ধনী জমিদারনন্দন। পিছনে অভিভাবকের এতটুকু নেই রাশ, হাতে টাকা আছে রাশি রাশি।

ছুটি ইংরেজ দম্পতি এসেছেন নয়াদিল্লী থেকে সাইকেল চেপে এই দারুণ গ্রীষ্মে। স্নানার্থে। নদীতে জল কোথাও বৃকের উপরে নয়, কিন্তু স্বচ্ছ। তারই মধ্যে ঘণ্টা কয়েক ধরে তাদের সন্তরণ অর্থাৎ সন্তরণের চেষ্টা চলল সোৎসাহে। ওপারে বালুচরে যে মৎস্যার্থী বৃকের দল ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর স্থায় নিশ্চল, নিথর, জলের উপর নিবদ্ধ-দৃষ্টি দাঁড়িয়ে শিকারের প্রতীক্ষা করছিল, স্নানার্থীদের সশব্দ জলক্রীড়া ও কলহাস্তে তাদের স্তৈর্য ক্ষুণ্ণ হলো। সচকিত হয়ে বারম্বার তারা স্থান পরিবর্তন করতে লাগল।

স্ত্রী-পুরুষের এই মিলিত স্নান পর্বটা তেমন রুচিকর নয় আমাদের

দেশে। প্রাচীন পন্থীদের কথা ছেড়েই দিলাম। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে যারা ইংরেজের অনুগামী, তাদের মধ্যেও মেয়েরা এটা খুব স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন না। ক্লাবে জিন্স বা ভারমুখ পান করে পরপুরুষের সঙ্গে ওয়লজ নাচতে যাদের বাধে না, তাঁরাও সহস্রানটা খুব শ্রীতির চোখে দেখেন না।

স্থির চিত্তে বিচার করলে বোঝা যাবে, এর মূলে আছে আমাদের সংস্কার। কিন্তু সংস্কারের মুক্তি তো যুক্তি দিয়ে হয় না, যেমন বুদ্ধি দিয়ে জয় হয় না ভূতের ভয়। সংস্কার রাতারাতি পরিহার করতে হলে চাই বিপ্লব, রয়ে সয়ে করতে হলে চাই অভ্যাস।

আমাদের প্রাচীন সমাজে নরনারীর একটা সম্মিলিত সত্তা খুব স্পষ্টরূপে স্বীকৃত নয়। উভয়ের ক্ষেত্র পৃথক, পরিবেশ বিভিন্ন এবং কতব্য আলাদা। একমাত্র ধর্ম আচরণ ব্যতীত স্ত্রী পুরুষের একত্র করণীয় কিছুই উল্লেখ আমাদের শাস্ত্রে নেই। শ্রীকৃষ্ণের রথে সুভদ্রার সারথিত্যকে বাদ দিলে সমগ্র পুরাণ, কাব্য ও সাহিত্যে স্বামী-স্ত্রীর মিলিত কর্মের দ্বিতীয় উপাখ্যান মিলে না। সাবিত্রী সত্যবানের সঙ্গে নিয়েছিলেন কাঠ কুড়োতে নয়, স্বপ্নে দেখা অমঙ্গলের ভয়ে। সেকালে পুরুষেরা করতো যজ্ঞ, যাজ্ঞ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, হলকর্ষণ ও বাণিজ্য। মেয়েরা করতো গো-ব্রাহ্মণের সেবা, রন্ধন ও গৃহমার্জনা। উভয়ের মধ্যে সাক্ষাতের সময় ও সুযোগ ছিল সঙ্কীর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে একমাত্র নিশীথে শয়্যাগৃহের স্বল্পপরিসর অবকাশের মধ্যেই তা নিবদ্ধ ছিল।

আমাদের একান্নবর্তী পরিবার প্রথাও স্বামী স্ত্রীর সর্বব্যাপী যোগাযোগকে বাধাগ্রস্ত করেছে পদে পদে। সেখানে স্বামী এবং স্ত্রী একটা বৃহৎ সংসারযন্ত্রের স্ক্রু বা বল্টু মাত্র, উভয়ে মিলে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটা সৃষ্টি নয়। সারিগমের তারা আলাদা ছুটি সুর, দুয়ে মিলে একটি অখণ্ড সঙ্গীত নয়। চৌধুরী বাড়ির মেজগিন্নী পারেন না বাড়ির আর তিনটি জা ও পাঁচটি ননদকে রেখে একা

স্বামীর সঙ্গে সিনেমায়, কিম্বা গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যেতে । বঠাকুরের মনেও আসবে না একা বড়গিন্নীকে দার্জিলিং কি সিমলা পাহাড়ে বেড়িয়ে আনার কথা ।

নরনারীর মিলিত অস্তিত্বের ধারণাটি আমাদের সমাজে অধুনাজাত । স্ত্রী পুরুষের পৃথক সত্তা পুরোপুরি মেনে নিয়েও উভয়ের মিলিত জীবনের একটি সমগ্র রূপ সম্প্রতি আমরা উপলব্ধি করতে শুরু করেছি এবং স্বীকার করতে দোষ নেই যে, এ-জ্ঞান আমরা ইউরোপের কাছ থেকে পেয়েছি । এখনও পুরুষ দশটা পাঁচটায় আপিস করে, আদালতে যায়, ব্যবসা বাণিজ্য চালায় এবং মেয়েরা ঘরকন্নার তত্ত্বাবধান করে, সন্দেহ নেই । কিন্তু দু'পক্ষের রেম্পনসিবিলিটি আলাদা হলেও পলিসির যোগ থাকে । এ যুগের স্ত্রীরা আদার ব্যাপারী হয়েও স্বামীদের জাহাজের খবর রাখেন ।

গৃহ এখন কেবলমাত্র স্ত্রীর প্রয়োজন ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিচারেই গঠিত নয় । বাইরে পুরুষের বন্ধুত্ব, সামাজিকতা ও অবসর বিনোদনও শুধু স্বামীর নিজস্ব অভিরুচির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় । প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীবজন্তুর মতো বর্তমানে একান্নবর্তী পরিবার লুপ্ত হচ্ছে ধীরে ধীরে । স্বামী, স্ত্রী ও দু'চারটি ছেলে মেয়ে নিয়ে যে নাতিবৃহৎ সংসার, তাতে স্বামীর স্থান গৃহকর্তার । সে স্বনামে পুরুষোদ্ধাত্ত । সে গৃহে স্ত্রীর পরিচয়ও মেজ, সেজ ঠা ছোট বউ রূপে নয়, আপন সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞীরূপে ।

অনেকেই ভুলে যান যে, স্বামীস্ত্রীর মিলিত জীবনের পরিপূর্ণতাও প্রয়াসের অপেক্ষা রাখে, সেটা আকস্মিক নয় । বিবাহ সে পরিপূর্ণতার লাইফ ইনসিওরেন্স নয়, গ্যারান্টি তো নয়ই । সে শুধু মীনস্, সে এও নয় । সামাজিক স্বীকৃতি ও আইনগত অধিকার দিয়ে বিবাহ স্ত্রীপুরুষের মিলনের ক্ষেত্রটিকে সুপারিসর ও নির্বিশ্ব করে মাত্র । তাকে সফল করতে হয় উভয়পক্ষের সযত্ন চেষ্টায়, নিরলস সাধনায় । আগে প্রেম ও পরে বিবাহকে যারা সমস্ত দাম্পত্য সমস্যার সমাধান

জ্ঞান করতেন, তাঁরা এখন ঠেকে শিখেছেন যে, কোর্টশিপ করে বিয়েও ফুল-প্রফ নয়, যেমন নয় ইন্টারভিউ দিয়ে কর্মচারী নিয়োগ।

স্বামী এবং স্ত্রী দিনে দিনে একে অণ্ডকে প্রভাবান্বিত করে, আপন রুচির দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা এবং মতবাদের দ্বারা। পরস্পরকে গঠন করে নিজ অভিলাষানুযায়ী, সৃষ্টি করে পলে পলে। এই দেওয়া নেওয়া, ভাঙ্গা গড়া চলে অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতে এবং অনেকটা অবিসংবাদে। সেটা সুগম হয় নিকটতম সান্নিধ্যের দ্বারা। সান্নিধ্য শুধু গৃহে নয়, বাইরেও।

মানুষের মন বহু বিচিত্র; তার পরিচয়ের নেই শেষ। তার সত্তা প্রব নয়, পরিবেশের পরিবর্তনে তার প্রকাশ হবে বিভিন্ন। স্ত্রী স্বামীকে চিনবে নানা পরীক্ষায়, উৎসবে বাসনে চৈব ছুঁভিক্ষে রাষ্ট্র বিপ্লবে। স্বামী স্ত্রীকে আবিষ্কার করবে তিল তিল করে নিত্য নব আবেষ্টনে, যেমন মণিকার হীরা, পান্না, মুক্তাকে করে নূতন ডিজাইনের বালাতে, চুড়িতে, চন্দ্রহারে। সুতরাং স্ত্রী যদি জলকেলির সঙ্গিনী হন, তবে তাঁকে এমন একটি বিশিষ্টরূপে পাই, যা সকাল বেলার সধুম চায়ের পেয়ালা-হস্তে প্রতীক্ষমান। গৃহিণীর মধ্যে নেই। স্ত্রীকে নাচঘরে অপরের বাহুল্য দেখে যঁারা রাগ না করেন, তাঁরা তাঁকে স্নানের সহচরী পেলে ছুঃখিত হবেন কেন? নারীদেহ সুইমিং কণ্টিউমে দেখলেই শকড্ হবেন এযুগে মার্কিন সিনেমা দেখে যঁারা চোখ পাকিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নিশ্চয় এমন কেউ নেই।

ঘোষজায়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। ফিরবার পথে মোটর থামালেন নিজামুদ্দিনের দরগায়। দরজা খুলে গেল ইতিহাসের এক অনধীত অধ্যায়ের।

পাঠান সম্রাট আলাউদ্দিন খিলিজী তৈরী করেছিলেন একটি মসজিদ সেদিনকার দিল্লীর একপ্রান্তে। তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে একদা এক ফকির এলেন সেই মসজিদে। ফকির নিজামুদ্দিন আউলিয়া। স্থানটি তাঁর পছন্দ হলো। সেখানেই রয়ে গেলেন এই

মহাপুরুষ। ক্রমে প্রচারিত হলো তাঁর পুণ্যখ্যাতি; অমুরাগী ভক্ত সংখ্যা বেড়ে উঠল দ্রুতবেগে।

স্থানীয় গ্রামের জলাভাবের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো তাঁর। মনস্থ করলেন খনন করবেন একটি দীঘি যেখানে তৃষ্ণার্ত পাবে জল, গ্রামের বধূরা ভরবে ঘট এবং নমাজের পূর্বে প্রক্ষালনের দ্বারা পবিত্র হবে মসজিদে প্রার্থনাকারীদল। কিন্তু সংকল্পে বাধা পড়ল অপ্রত্যাশিতরূপে। উদ্দীপ্ত হলো রাজরোষ। প্রবল পরাক্রান্ত সুলতান গিয়াসুদ্দিন তোগলকের বিরক্তিভাজন হলেন এক সামান্য ফকির, দেওয়ানা নিজামুদ্দিন আউলিয়া।

তোগলক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসুদ্দিনের পিতৃপরিচয় কৌলীণ্যযুক্ত নয়। ক্রীতদাসরূপে তাঁর জীবন আরম্ভ। কিন্তু বীর্য এবং বুদ্ধির দ্বারা আলাউদ্দিন খিলিজীর রাজত্বকালেই গিয়াসুদ্দিন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একজন বিশিষ্ট ওমরাহরূপে। সম্রাটের মালিকদের মধ্যে তিনি হয়েছিলেন অন্যতম। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পরে ছয় বৎসর পর পর রাজত্ব করল দুজন অপদার্থ সুলতান, যারা আপন অক্ষম শাসনের দ্বারা দেশকে পৌঁছে দিল অরাজকতার প্রায় প্রাপ্ত সীমানায়। গিয়াসুদ্দিন তখন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা। এমন সময় খসরু খান নামক এক ধর্মত্যাগী অন্ত্যজ হিন্দু দখল করলো দিল্লীর সিংহাসন। গিয়াসুদ্দিন তাঁর সৈন্যদল নিয়ে অভিযান করলেন পাঞ্জাব থেকে দিল্লী, পরাজিত ও নিহত করলেন খসরু খানকে, সগৌরবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন বাদশাহী তক্তে।

গিয়াসুদ্দিনের দৃঢ়তা ছিল, শক্তি ছিল, রাজ্যশাসনে দক্ষতা ছিল। কিন্তু ঠিক সে অনুপাতেই তাঁর নিষ্ঠুরতাও ছিল ভয়াবহ। একদা দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের অসাবধানী রসনায় রটনা শোনা গেল গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর। সুলতানের কানেও পৌঁছল সে ভিত্তিহীন জনরব। কিছুমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ না করে সুলতান আদেশ করলেন তাঁর সিপাহীশালারকে, “লোকে আমাকে মিথ্যা কবরস্থ

করেছে, কাজেই আমি তাদের সত্যি সত্যি কবরে পাঠাতে চাই।” অগণিত হতভাগ্যের জীবনান্ত ঘটলো নিমেষে নিমেষে ; গোরস্থানে শবভুক পশুপক্ষীর হলো মহোৎসব।

কিন্তু গিয়াসুদ্দিনের বিচক্ষণতা ছিল। সেকালে মুঘলদের আক্রমণ এবং তার আনুষঙ্গিক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন ছিল উত্তর ভারতের এক নিরন্তর বিভীষিকা। গিয়াসুদ্দিন তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করতে পত্তন করলেন নূতন নগর, তৈরী করলেন নগর ঘিরে দুর্ভেদ্য প্রাচীর এবং প্রাচীরদ্বারে দুর্জয় দুর্গ। একদিকে ক্ষুদ্র পর্বত আর একদিকে প্রাচীরবেষ্টিত নগরী। মাঝখানে খনিত হলো বিশাল জলাশয়। বর্ষার দিনে শৈলশিখর থেকে ধারাস্রোতে জল সঞ্চিত হতো এই জলাশয়ে ; সম্বৎসরের পানীয় সম্পর্কে নিশ্চিত আশ্বাস থাকতো প্রজাপুঞ্জের।

ফকির ও সুলতানে সংঘর্ষ ঘটলো এই নগর নির্মাণ, কিস্তি আরও সঠিকভাবে বললে বলতে হয় নগর প্রাচীর নির্মাণ, উপলক্ষ্য করেই।

নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দীঘি কাটাতে মজুর চাই প্রচুর। গিয়াসুদ্দিনের নগর তৈরী করতেও মজুর আবশ্যক সহস্র সহস্র। অথচ দিল্লীতে মজুরের সংখ্যা তখন অত্যন্ত পরিমিত, দু’ জায়গার প্রয়োজন মিটানো অসম্ভব। অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, বাদশাহ চাইলেন মজুরেরা আগে শেষ করবে তাঁর কাজ, ততক্ষণ অপেক্ষা করুক ফকিরের খয়রাতী খনন। কিন্তু রাজার জোর অর্থের, সেটা পরিমাপ করা যায়। ফকিরের জোর হৃদয়ের, তার সীমা শেষ নেই। মজুরেরা বিনা মজুরীতে দলে দলে কাটতে লাগলো নিজামুদ্দিনের গালাও। সুলতান হুকুম ছেড়ে বললেন, ‘তবে রে—’

কিন্তু তার ধ্বনি আকাশে মিলাবার আগেই এতলা এলো আশু পতব্যের। বাংলাদেশে বিদ্রোহ দমন করতে ছুটতে হলো সৈন্ত নামস্ত নিয়ে।

শাহজাদা মহম্মদ তোগলক রইলেন রাজধানীতে রাজপ্রতিভুরূপে। তিনি নিজামুদ্দিনের অনুরাগীদের অন্ততম। তাঁর আনুকূল্যে দিবা রাত্রি খননের ফলে পরহিতব্রতী সন্ন্যাসীর জলাশয় জলে পূর্ণ হলো অনতিবিলম্বে। তোগলকাবাদের নগরপ্রাচীর রইল অসমাপ্ত।

অবশেষে সুলতানের ফিরবার সময় হলো নিকটবর্তী। প্রমাদ গণনা করলো নিজামুদ্দিনের অনুরাগীরা। তারা ফকিরকে অবিলম্বে নগর ত্যাগ করে পলায়নের পরামর্শ দিল। ফকির মূঢ় হাশ্বে তাদের নিরস্ত করলেন, “দিল্লী দূর অস্ত্”। দিল্লী অনেক দূর।

প্রত্যহ যোজন পথ অতিক্রম করছেন সুলতান। নিকট হতে নিকটতর হচ্ছেন রাজধানীর পথে। প্রত্যহ ভক্তেরা অনুনয় করে ফকিরকে। প্রত্যহ একই উত্তর দেন নিজামুদ্দিন,—দিল্লী দূর অস্ত্।

সুলতানের নগর প্রবেশ হলো আসন্ন, আর মাত্র একদিনের পথ অতিক্রমণের অপেক্ষা। ব্যাকুল হয়ে শিষ্য প্রশিষ্যেরা অনুনয় করলো সন্ন্যাসীকে, এখনও সময় আছে, এই বেলা পালান। গিয়াসুদ্দিনের ক্রোধ এবং ক্রুরতা অবিদিত ছিল না কারো কাছে, ফকিরকে হাতে পেলে কী দশা হবে তার সে কথা কল্পনা করে তারা ভয়ে শিউরে উঠলো বারম্বার। স্মিতহাশ্বে সেদিনও উত্তর করলেন বিগতভয় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, “দিল্লী হুজ দূর অস্ত্”। দিল্লী এখনও অনেক দূর। বলে’ হাতের জপের মালা ঘোরাতে লাগলেন নিশ্চিত্ত ঔদাসীণ্ডে।

নগরপ্রান্তে পিতার অভ্যর্থনার জন্য মহম্মদ তৈরী করেছেন মহার্ঘ মণ্ডপ। কিংখাবের সামিয়ানা। জরীতে, জহরতে, ঝলমল। বাদ্যভাণ্ড, লোক লঙ্কর, আমীর ওমরাহ মিলে সমারোহের চরমতম আয়োজন। বিশাল ভোজের ব্যবস্থা, ভোজের পরে হস্তীযুথের প্রদর্শনী প্যারেড।

মণ্ডপের কেন্দ্রস্থলে ঈষৎ উন্নত ভূমিতে বাদশাহের আসন, তার পাশেই তাঁর উত্তরাধিকারীর। পরদিন গোখুলি বেলায় সুলতান প্রবেশ করলেন অভ্যর্থনা মণ্ডপে। প্রবল আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে

আসন গ্রহণ করলেন। সিংহাসনের পাশে বসালেন নিজ প্রিয়তম পুত্রকে। কিন্তু সে মহম্মদ নয়, তার অনুজ।

ভোজনাশ্তে মহম্মদ বিনয়াবনত কণ্ঠে অনুমতি প্রার্থনা করলো সম্রাটের। জাহাপনার হুকুম হলে এবার হাতীর কুচকাওয়াজ শুরু হয়, হস্তীযুথ নিয়ন্ত্রণ করবেন তিনি নিজে। গিয়াসুদ্দিন অনুমোদন করলেনঃস্মিত হাস্যে।

মহম্মদ মণ্ডপ থেকে নিজ্জান্ত হলো ধীর শান্ত পদক্ষেপে।

কড়্ কড়্ কড়্ কড়াৎ।

একটি হাতীর শিরশঞ্চালনে স্থানচ্যুত হলো একটি স্তম্ভ। মূহূর্ত মধ্যে সশব্দে ভূপতিত হলো সমগ্র মণ্ডপ।

চার দিকে ছড়িয়ে পড়লো অসংখ্য কাঠের থাম। চাপাপড়া মানুষের আর্ত কণ্ঠে বিদীর্ণ হলো অন্ধকার রাত্রির আকাশ। ধূলায় আচ্ছন্ন হলো দৃষ্টি। ভীত সচকিত ইতস্ততঃ ধাবমান হস্তীযুথের গুরুভার পদতলে নিষ্পিষ্ট হলো অগণিত হতভাগ্যের দল এবং সে-বিভ্রান্তকারী বিশৃঙ্খলার মধ্যে উদ্ধারকর্মীরা ব্যর্থ অনুসন্ধান করলো বাদশাহের।

পরদিন প্রাতে মণ্ডপের ভগ্নস্তুপ সরিয়ে আবিষ্কৃত হলো বৃদ্ধ সুলতানের মৃত দেহ। যে প্রিয়তম পুত্রকে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনিত করেছিলেন মনে মনে, তার প্রাণহীন দেহের উপরে সুলতানের দুই বাহু প্রসারিত। বোধ করি আপন দেহের বর্মে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তাঁর স্নেহাস্পদকে।

ঐহিকের সমস্ত ঐশ্বর্য প্রতাপ ও মহিমা নিয়ে সপুত্র গিয়াসুদ্দীনের শোচনীয় জীবনান্ত ঘটলো নগরপ্রান্তে। দিল্লী রইল চিরকালের জন্য তাঁর জীবিত পদক্ষেপের অতীত।

দিল্লী দূর অস্ত্। দিল্লী অনেক দূর।

চার

নিজামুদ্দিনের দরগায় প্রবেশ করে আজও প্রথমেই চোখে পড়ে আউলিয়া খনিত পুকুর। তার পাশ দিয়ে আসা গেল এক প্রশস্ত চত্বরে যার মাঝখানে সমাধিস্ত হয়েছ ফকিরের দেহ। সমাধির উপরে ও আশে পাশে রচিত হয়েছে সুদৃশ্য ভবন ও অলিন্দ। উত্তরকালে সম্রাট সাজাহান সমাধির চারদিক ঘিরে তৈরী করেছেন শ্বেত পাথরের খিলান; প্রাঙ্গণ বেষ্টিত করেছেন সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত জালিকাটা পাথরের দেয়ালে। দ্বিতীয় আকবর রচনা করেছেন সমাধির উপরিস্থ গম্বুজ। ফকিরের পুণ্য নামের সঙ্গে আপনাকে যুক্ত করে নিজেকে তাঁরা ধন্য জ্ঞান করেছেন।

গিয়াসুদ্দীনের রাজধানী তোগলকাবাদ আজ বিরাট ধ্বংসস্থূপে পরিণত; বি. বি. সি. আই রেলওয়ের লাইন গেছে তার উপর দিয়ে। একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণায় এবং টুরিষ্টদের দ্রষ্টব্য হিসাবে আজ তার গুরুত্ব। নিজামুদ্দিনের দরগায় আজও মেলা বসে প্রতি বছর, দূর দূরান্ত থেকে পুণ্যকামীরা আসে দর্শনাকান্ডকায়। সেদিনের রাজধানী তার অভভেদী অহঙ্কার নিয়ে বহুদিন আগে মিশেছে ধূলায়; দীন সন্ন্যাসীর মহিমা পুরুষানুক্রমে ভক্তজনের সশ্রদ্ধ অন্তরের মধ্য দিয়ে রয়েছে অম্লান। তার আকর্ষণ দূরকালে প্রসারিত।

হিন্দুর অন্তিম অভিলাষ গঙ্গাতীরে দেহরক্ষার ন্যায় শত শত বর্ষ ধরে দিল্লীর বিত্তশালীরা কামনা করেছেন আউলিয়ার কবরের নিকটে সমাধিস্থ হতে, চেয়েছেন জীবনান্তে ‘মীর মজলিসের’ সান্নিধ্য। তাই তার আশে পাশে আছে সংখ্যাতিত আমির ওমরাহের সমাধি। তারই মধ্যে একটির গর্ভে আছে কবি আমির খসরুর দেহাবশেষ।

খসরুর প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর ; খ্যাতি ছিল বহুবিস্তৃত । দিল্লীর কবিগোষ্ঠীতে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ । আলাউদ্দিন খিলজীর কাব্যরসিক পুত্র খিজির খানের সঙ্গে তার হৃদয়তা ছিল গভীর । আপন অনুপম ছন্দে গ্রন্থিত করে খিজির খানের বীরত্বকাহিনীকে তিনি কালজয়ী অমরত্ব দান করে গেছেন ।

নিজামুদ্দিনের সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রে আর একজন কবি রয়েছেন চিরনিদ্রিত, যার রচনা আজও উর্দু সাহিত্যে অজাতশত্রু । কবি গালিবের সমাধিটি আড়ম্বরহীন, সাধারণ প্রস্তর বেদিকায় মাত্র আবৃত । ঊনবিংশ শতাব্দীর উর্দু সাহিত্য অম্লান রেখেছে তাঁর স্মৃতি, কাব্যে ও গাথায় । জগতে বহু ঐশ্বর্যময় সৌধ রচিত হয় অক্ষম ব্যক্তিদের সমাধির উপরে । কিন্তু কবি 'পরে ভার থাকে নিজ মেমোরিয়ালের ।

হিন্দু যুগে রেওয়াজ ছিল না স্মৃতিসৌধের । তার কারণ মরলোকের চাইতে পরলোকের দিকে হিন্দুদের দৃষ্টি ছিল বেশী । তাই শ্মশানে দালান খাড়া করে প্রিয়জনের স্মৃতি অক্ষয় করার কথা কখনও তাদের মনে হয়নি । মৌর্য রাজাদের আমল থেকে পৃথ্বীরাজ পর্যন্ত কোনো হিন্দু রাজা ~~রাখে~~ কোনো স্মৃতি সৌধ । রাজপুত রাজগোরা গড়েননি কোনো এতমদৌলত, সফদারজঙ্গ বা হুমায়ুন'স টুঙ্গ । তারা জলাশয় খনন করেছেন, মন্দির স্থাপন করেছেন, ভূমিদান, গোদান করেছেন ব্রাহ্মণকে । সমস্তই জগৎ-হিতায় । অশোক যে স্তম্ভ রচনা করেছিলেন, তা নিজ কীর্তি ঘোষণার জন্য নয়, জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে । বুদ্ধ গড়েছিলেন চৈত্য ও বিহার সঙ্ঘের জন্য ; শঙ্করাচার্য স্থাপন করেছেন মঠ বেদান্ত চর্চার মানসে ।

সে-যুগে হিন্দুর জীবনে শেষ কথা ছিল ভক্তি । সূর্যমুখী ফুলের মতো তার সমস্ত কর্ম, চিন্তা, ধ্যান, ধারণা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ভগবানে উদ্ভিষ্ট । ঐহিকের সম্পর্কে তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি । যখন কস্তে কান্তা কস্তে পুত্র, তখন প্রেম দিয়ে আর হবে কী ? মায়াময়মিদম্ অখিলং বিশ্বম্ । কাজেই পিতাকে হতে হয়েছে পরমং

তপঃ, স্বামীকে হতে হয়েছে পতিদেবতা, স্ত্রীকে হতে হয়েছে সহধর্মিণী। নারী যে সহমৃত্যু হয়েছে তার কতটা প্রেমের আকর্ষণে আর কতটা পুণ্যলোভবশে তা বলা শক্ত। স্বয়ম্বর যারা হয়েছে, তাঁরা প্রেমে পড়ে নয়। সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের গলায় মালা দিয়েছিলেন তাঁর খ্যাতি ও বৈভবের জন্য, যেমন একালের তরুণীরা আংটি পরিয়ে দেন আই, সি, এসের অঙ্গুলিতে।

মুসলমানেরাই আনলো ভিন্ন জীবনাদর্শ। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে তাদের নয়। তারা পরকালকে খোরাই পরোয়া করলো; ইহকালকে করলো সর্বস্ব। তারা জীবনকে করলো ভোগ, কাঁদলো, কাঁদালো এবং ভালোবাসলো। তাই নারীর জন্য করলো লুণ্ঠন, প্রেমের জন্য করলো অপহরণ এবং প্রিয়জনের জন্য হনন ও বহু অপকর্ম সাধন। বলা বাহুল্য, এর সবগুলি সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু প্রেম কি কারও সমর্থনের অপেক্ষা রাখে? মেনে চলে নীতির অনুশাসন? অহল্যা করেছে সমাজের বা শাস্ত্রের সমর্থনের অপেক্ষা? মহাভারতের অর্জুন করেছে? বৃন্দাবনের কানু করেছে? করেছে রিজিয়া বেগম, মেরী ওয়ালেউস্কা বা লেডী হ্যামিল্টন?

মুসলমানেরা প্রিয়তম-প্রিয়তমার স্মৃতিকে করতে চেয়েছে কালজয়ী। রাখতে চেয়েছে স্মারকচিহ্ন। তাই সৌধ গড়েছে পিতার, পতির, পত্নীর এমন কি উপপত্নীর সমাধিতে। হিন্দুরা তপস্বী, তারা দিয়েছে বেদ ও উপনিষদ। মুসলমানেরা শিল্পী, তারা দিয়েছে তাজ ও রঙমহল। হিন্দুরা সাধক, তারা দিয়েছে দর্শন। মুসলমানেরা গুণী, তারা দিয়েছে সঙ্গীত। হিন্দুর গর্ব মেধায়, মুসলমানের গৌরব হৃদয়ের। এই দুই নিয়েই ছিল ভারতবর্ষের অতীত; এ দুই নিয়েই হবে তার ভবিষ্যৎ। একটিকে বাদ দিলেই হয় পাকিস্তান,—মিস্টার মহম্মদ আলী জিন্না না চাইলেও।

যাত্রাসহচরী দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন একটি ক্ষুদ্র মর্মর সমাধির প্রতি। সেটি সম্রাট হুহিতা জাহানারার।

ইতিহাসে সম্রাট আলমগীরের শাসন বিধর্মী নির্যাতনের 'দুরপনেয় কলঙ্কে মলিন ; সে-তথ্য স্কুলপাঠ্য পুস্তকে আছে। কিন্তু এই হৃদয়হীন অথচ অমিতবিক্রম যোদ্ধা নৃপতির জীবন যে দু'টি বিশিষ্ট উপদ্রুতা বন্দিনীর উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে অভিশপ্ত ছিল, সে-কথা যথোচিত বিদিত নয় জগতে।

জাহানারা ও জেবুন্নেসা দু'জনেই ছিলেন আওরঙ্গজেবের অতি নিকটতম আত্মীয়া। একজন অনুজা, অপর জন আত্মজা। দু'জনেই ছিলেন রূপসী, দু'জনেই ছিলেন অসাধারণ নির্ভীক ও তেজস্বিনী। দু'জনেই চিরকুমারী এবং দু'জনেরই জীবনের সুদীর্ঘকাল কেটেছে আওরঙ্গজেবের কারাগৃহে।

কিন্তু আর এক জায়গায় এই দুই দুর্ভাগিনীর মিল ছিল গভীরতর। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন কবি। মুঘল যুগের মহিলা কবি।

জাহানারার সমগ্র রচনা সম্বন্ধে রক্ষিত হয়নি। গহন অরণ্যে প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতো প্রায় সবই লোকচক্ষুর অন্তরালে ধূলিতে হয়েছে বিলীন, দু'একটি মাত্র নিদর্শন আছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

জেবুন্নেসার কাব্যখ্যাতি অধিকতর বিস্তৃত। 'জেব-উল-মুনশোয়াতে' সত্যিকার কবিপ্রতিভার চিহ্ন আছে। বিখ্যাত পারশ্ব কাব্যগ্রন্থ 'দিওয়ানে মখফীর' রচয়িত্রীরূপেও জেবুন্নেসার উল্লেখ আছে অনেক গ্রন্থে, যদিও পণ্ডিতেরা সম্প্রতি সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন।

জাহানারা আমাকে আকৃষ্ট করেছে শৈশব থেকে। ইতিহাস পরীক্ষার পূর্বক্লে সন তারিখে কণ্টকাকীর্ণ মুঘল কাহিনী কণ্ঠস্থ করার ছুরুছ প্রয়াস করতেম প্রাণপণে দীর্ঘরাত্রিব্যাপী। ঘুমে চোখের পাতা আসতো জড়িয়ে, দেহ হতো অলস, মাথা ঝিমিয়ে পড়তো ঢুলুনীতে। ওরই মধ্যে জাহানারার উপাখ্যান পড়ে কল্পনায় আঁচ করার চেষ্টা করতাম তাঁর চেহারা।

প্রথম যৌবনে জাহানারা পাদশাহ বেগমের মর্যাদা ভোগ করেছেন বিপুল মহিমায়। হারেমে করেছেন একাধিপত্য। অপ্রতিহত অনুগ্রহ ও শাসন বিতরণ করেছেন দুই হস্তে। কন্যাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সাজাহানের প্রিয়তরা। তাঁরই জন্ম সম্রাট তৈরী করেছিলেন দিল্লীর জুম্মা মসজিদ, ভারতের বৃহত্তম মুসলিম ভজনালয়।

জাহানারার স্নেহভাজন ছিল এক বাঁদী, অতর্কিতে একদিন আগুন লাগল তার বসনে। সে-আগুন নেভাতে গিয়ে শাহজাদী নিজে দগ্ধ হলেন সাংঘাতিকরূপে। রাজ্যের নানা জায়গা থেকে এল হাকিম, হলো নানা রকম এলাজ। কিন্তু ফল হলো না কিছুই। সম্রাটনন্দিনীর জীবনসংশয় দেখা দিল।

বিচলিত সাজাহান এতলা দিলেন এক সাহেব চিকিৎসককে। গ্যাব্রিয়েল বাউটন। সুরাটে ইংরেজের কুঠির ডাক্তার। বাউটন বললেন, ওষুধ দিতে হলে রোগিনীকে চোখে দেখা চাই। শুনে সভাসদেরা হতবাক হলেন। বলে কি বেয়াদপ, শাহনশাহ বাদশাহের জেনানা মানে না কম্বক্ত? কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিতৃস্নেহ জয়লাভ করলো সামাজিক প্রথার উপরে। সাজাহান সম্মত হলেন বাউটনের প্রস্তাবে। অল্পকাল মধ্যে আরোগ্য লাভ করলেন জাহানারা। তাঁর অনুরোধে সাজাহান বাউটনকে দিতে চাইলেন পুরস্কার, যা চাইবে তাই পাবে। আভূমিনত কুর্নিশ করে বাউটন বলল, নিজের জন্ম কিছুই চাইনে। কলকাতার ১৪০ মাইল দক্ষিণে বালাশোরে ইংরেজের কুঠি নির্মাণের জন্ম প্রার্থনা করি একটুকরো ভূমিখণ্ড। ইংরেজকে দান করুন এদেশে বিনা (শুল্কে) বাণিজ্যের অধিকার।

বাউটনের প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। স্বজাতিহিতৈষণার এত বড় দৃষ্টান্ত আর একটি মাত্র আছে আধুনিক কালে। সেটি ইহুদী বৈজ্ঞানিক ডক্টর কাইম ভাইজমানের।

১৯১৬ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের যখন সঙ্কটজনক কাল, ইংলণ্ডে বিস্ফোরক উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান অ্যাসিটোনের অভাব, তখন

কৃত্রিম অ্যাসিটোন তৈরীর ভার নিলেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনিভার্সিটির এক অধ্যাপক। প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ বললেন, প্রফেসর, সমগ্র ব্রিটেনের ভাগ্য নির্ভর করছে তোমার সফলতা বিফলতার উপরে। আমি চাই তাড়াতাড়ি কাজ, তাড়াতাড়ি ফললাভ।

অধ্যাপক বললেন, তথাস্তু।

দিবারাত্রির অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে আবিষ্কার করলেন কৃত্রিম অ্যাসিটোন। পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করলেন ব্রিটেনকে এই বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ভাইজমান।

কৃতজ্ঞ লয়েড জর্জ তাঁকে ডেকে দিতে চাইলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

ভাইজমান প্রত্যাখ্যান করলেন সবিনয়ে।

লয়েড জর্জ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, পিয়ারেজ? অর্থ?

“কিছু নয়। একটি মাত্র যাজ্ঞ আছে আমার। আমার স্বজাতির জন্য চাই নির্দিষ্ট একটি দেশ; ইহুদীদের গ্যাশগাল হোম।”

কিছুকাল পরে বালফোর ঘোষণায় ইহুদীদের জন্য প্যালেস্টাইনে নির্দিষ্ট হলো জাতীয় বাসস্থান। অবশ্য কাগজে পত্রে। আজও প্রকৃত অধিকার স্থাপিত হলো না ইহুদীদের। বরং ইদানীং কনসারভেটিভরা প্যালেস্টাইনে আরবদেরই করতে চাইছেন সুয়ো রাণী, মধ্য প্রাচ্যে ইংরেজ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনে। কৃতজ্ঞতা কথাটা আছে ইংরেজের ভাষায়, নেই ইংরেজ চরিত্রে।

জাহানারার অনুগ্রহে ইংরেজেরা বাণিজ্য নিরঙ্কুশ করলেন ভারতবর্ষে, সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনা করলেন সকলের অলক্ষ্যে। সেই জাহানারার চরিত্রেই কলঙ্ক আরোপ করে ইতিহাস রচনা করেছে ইংরেজ। এতে বিস্মিত হইনে। যে সিভিলিয়ান ভারতবর্ষের পেন্সনে স্ট্যাফোর্ডশায়ারে বাড়ী হাঁকিয়ে আছেন, তিনিই ভারতের নিন্দা করেন সব চেয়ে জোর গলায়। লিওপোল্ড এমারীই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সব চেয়ে বড় শত্রু, কারণ তাঁর জন্ম গোরখপুরে।

জাহানারার জীবন নাট্যের শেষ দৃশ্যগুলি বেদনাবিধুর।

সাজাহানের পুত্রদের মধ্যে দারাসিকো ছিলেন পিতার সর্বাপেক্ষা প্রীতিভাজন। কিন্তু তাঁর অনুরক্তি ছিল খ্রীষ্ট ধর্মে। সেটা মুসলিম সমাজে জনপ্রিয়তার উপায় নয়। পিতার অসুস্থতার সংবাদে সুজা সৈন্যসামন্ত নিয়ে রওনা হলেন দিল্লী অভিমুখে। বারাণসীর যুদ্ধে দারা তাঁকে করলেন পরাজিত। আওরঙ্গজেব তখন মোরাদকে বললেন, এ ছলনা চাতুরীময়, পৃথিবীর কোনো কিছুতেই লোভ নেই তাঁর। তাঁরা দু'জনে মিলে দারাকে পরাজিত করলে সাজাহান যদি পরলোকগত হন—আল্লামার দোয়ায় তিনি যেন সেরে ওঠেন—তবে দিল্লীর সিংহাসন হবে তাঁর অর্থাৎ মোরাদের। মতাপ মোরাদের প্রতীতি হলো এই আশ্বাসে। দারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন পাঞ্জাবে, এক উৎসব রজনীর অবসানে সুরামত্ত মোরাদ হলো বন্দী, আওরঙ্গজেব নিজকে ঘোষণা করল সম্রাটরূপে, পিতা সাজাহানকে কয়েদ করে আবদ্ধ করল আগ্রা দুর্গের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে।

আওরঙ্গজেব জাহানারাকে দিতে চেয়েছিলেন পাদশাহ বেগমের পদ। কিন্তু জাহানারা প্রত্যাখ্যান করলেন সে অনুরোধ। স্বেচ্ছায় বরণ করলেন সাজাহানের সহ-বন্দীত্ব। পিতার পরিচর্যার জন্ত। চতুর্দিকে ক্রুর প্রবঞ্চনা, সীমাহীন বিশ্বাসঘাতকতার ঘন অন্ধকারের মধ্যে সেদিন একমাত্র জাহানারা রইল অচল, অটল, অকম্পিত দীপশিখার মতো দীপ্তিময়। সাজাহানের দ্বিতীয় কন্যা রোসেনারা আওরঙ্গজেবের পক্ষ নিলেন, হলেন তাঁর প্রিয়পাত্রী। দিল্লীর সিভিল লাইনসে আছে তাঁর উদ্যান। সেখানে এ আমলে স্থাপিত হয়েছে রোসেনারা ক্লাব, দিল্লীর মটিকালো। দশ টাকা পয়েন্টে স্টেকে ব্রিজ খেলার খ্যাতি আছে তার উত্তর ভারতে।

দিনের পর দিন গত হয়, মাসের পর মাস। চক্রাকারে আবর্তিত হয় ষড় ঋতু। গ্রীষ্ম গত হয় তার উত্তাপ ও প্রভঞ্জন আছতি নিয়ে। বর্ষায় মেঘকজ্জল দিবসের দীর্ঘ ছায়া নামে যমুনার কালো জলে। বর্ষণমুখর রাত্রির বিদ্যুৎ চমকে উৎফুল্ল ভবন-শিখীরা নৃত্য করে

প্রাসাদের মর্মর অলিন্দে । শরতের আলো-ছায়া বিজড়িত প্রভাতে
নদীতীরে কাশের বনে লাগে দোলা । হেমন্ত আনে কুহেলী ; শীত
দেয় হতাশাস । বসন্তে ফুলের মঞ্জরী আন্দোলিত হয় শিরীষের
শাখা প্রশাখায় । আগ্রার প্রাসাদ প্রাচীরের অন্তরালে জাহানারার
বন্দী-জীবনে একটি করে বৎসর হয় বৃদ্ধি, আয়ু থেকে খসে পড়ে
একটি করে বছর । কর্মহীন অবসরে শাহজাদী কবিতা রচনা
করেন আপন মনে ।

একদা নিশীথকালে আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে সাজাহানের
কাছে এসে পৌঁছল একটি সুদৃশ্য মোড়ক । পুত্র পাঠিয়েছে পিতাকে
উপহার । তবে কি অনুতপ্ত পুত্রের ক্ষমা প্রার্থনার প্রথম নিদর্শন ?
আগ্রহকম্পিত হস্তে বৃদ্ধ সাজাহান খুললেন মোড়ক । পরতের পর
পরত । খুলতে খুলতে শেষকালে হাত থেকে গড়িয়ে পড়ল
সাজাহানের প্রিয়তম পুত্র দারা সিকোর খণ্ডিত মূণ্ড । সম্রাট মূর্ছিত
হয়ে পড়লেন জাহানারার অঙ্কে ।

সাজাহানের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জাহানারা রইলেন তাঁর
পাশে । স্ববির পিতার পরিচর্যা করলেন অমিত নিষ্ঠা ও অবিচলিত
ধৈর্যে । তাঁর মৃত্যুর পরে প্রত্যাবর্তন করলেন দিল্লীতে ।

অবশেষে রমজানের এক পুণ্য তিথিতে মৃত্যুর শাস্ত শীতল
ক্রোড়ে মুক্তিলাভ করলো বন্দিনী । তাঁরই ইচ্ছায় তাঁর দেহ
সমাধিস্থ হলো ফকির নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধির পার্শ্বে । সে
সমাধির উপরে না রইল মণ্ডপ, না রইল আচ্ছাদন, না রইল
ঐহিক ঐশ্বর্যের লেশমাত্র আভাস । শুধু তাঁরই স্বরচিত একটি
কবিতা উৎকীর্ণ হলো তার গায়ে,—

“বেগায়র সবজা না পোশাদ কসে মাজারে মারা

কে কবর পোষে গরিবান্ হামিন্ গিয়াহ বসন্ত ।”

“একমাত্র ঘাস ছাড়া আর যেন কিছু না থাকে আমার সমাধির
উপরে । আমার মতো দীন অভাজনের সেই তো শ্রেষ্ঠ আচ্ছাদন ।”

পুণ্যশ্লোক নিজামুদ্দিন আউলিয়ার অনুগামিনী সাজাহান হুহিতা
নশ্বর জাহানারার এইতো যোগ্য সমাধি ।

আসন্ন সন্ধ্যার শান্ত নিস্তব্ধতায় শ্রদ্ধানত্ৰ চিত্তে সামনে এসে
দাঁড়ালেম আমরা তিন দর্শনার্থী । কারো মুখে ছিল না কথা, কিন্তু
মনে ছিল ভার ।

নব শ্যাম দূর্বাদল ছেয়ে আছে ক্ষুদ্র নিরলঙ্কার সমাধি । নির্মল
নীল আকাশ থেকে প্রত্যহ নিশীথে সিঞ্চিত হয় বিন্দু বিন্দু শিশির,
প্রভাতে স্পর্শ করে তরুণ অরুণের প্রথম কিরণ রেখা, সন্ধ্যায় ছড়িয়ে
পড়ে গোধূলি আলোকের সোনালী আভা । তারা কি পায় শতাধিক
বর্ষ পূর্বে সমাধিস্থ সেই অঙ্গের ললিত সুবাস ? পায় তাঁর সুকুমার
বন্ধের নীচে ভক্তিনত হৃদয়ের মৃদু স্পন্দন ধ্বনি ?

পাঁচ

প্রভাতের সব চেয়ে বড় সেন্সেশন। স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে বেরিয়েছে ক্রীপস প্রস্তাবের সার মর্ম। নিজস্ব সংবাদদাতার বিশ্বস্তমূত্রে পাওয়া স্পেকুলেশন। শোনা গেল, গভর্নমেন্ট বিচলিত হয়েছেন এ সংবাদ প্রকাশে। গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তারা তদন্ত শুরু করেছেন সংবাদের সূত্র সম্পর্কে।

সাংবাদিক মহলে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। কারণ প্রস্তাবগুলির কিছুটা আঁচ আমরা সবাই পেয়েছিলাম গত কদিন ধরেই। প্রকাশ করা হয় নি, জেন্টলমেনস এগ্রীমেন্ট স্বরণ করে। ইংরেজ ও আমেরিকান সহ-সংবাদদাতারা অনুমান করলেন, ভাইসরয়'স্ কাউন্সিলের কোনো মহামান্য সদস্যের কাছ থেকে বেরিয়েছে এ খবর।

জনশ্রুতি এই যে, ক্রীপস যে-দিন এলেন, বেলা সাড়ে বারোটা থেকে অনাহারে ভাইসরয়'স্ হাউসে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন এই মাননীয় সদস্যগণ। বেলা দুটোয় এলেন ক্রীপস। লর্ড লিনলিথগো আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে সারিবন্দী দণ্ডায়মান নিজ সহকর্মীদের। ক্রীপস করমর্দন করলেন সবার সঙ্গে, নিরাসক্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন “হাউ ডু ইউ ডু?” দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করে মুহূর্তে অন্তর্হিত হলেন আপন নির্দিষ্ট কক্ষে।

তাঁরা আশা করেছিলেন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে ক্রীপস তাঁর প্রস্তাব আলোচনা করবেন তাঁদের সঙ্গে, জানতে চাইবেন তাঁদের অভিমত। সেদিক দিয়েও হতাশ হলেন। ক্রীপস প্রস্তাবের সারমর্ম অনুদ্যাটিত রইল তাঁদেরও কাছে। আশ্চর্য নয় যে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হলেন। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর হলেও হাজার হোক মানুষের শরীর তো! শোনা যায়, অবশেষে ভাইসরয়ের সুপারিশে

বিগত রাত্রে লাট প্রাসাদে অনুষ্ঠিত এক ভোজ সভায় ক্রীপস তাঁর প্রস্তাবের চুম্বক জানিয়েছেন তাঁদের। আজই প্রভাতে সংবাদপত্রের উৎসাহী নিজস্ব রিপোর্টারের জবানীতে ঘটলো তার প্রকাশ। ধূম দ্বারা যদি পর্বতের বহিঃ অনুমান করা সম্ভব হয়, তবে বিদেশী সংবাদদাতাদের সন্দেহ একেবারে অগ্রাহ্য করা কঠিন।

সংবাদ 'স্কুপ' করার অধিকার সাংবাদিকের আছে। কিন্তু তারও একটা অলিখিত মাত্রা আছে। জাতির বা দেশের বৃহত্তর স্বার্থ যেখানে জড়িত, সেখানে সাংবাদিকের আপন বিবেক সেন্সর করে তার কপি। এডোয়ার্ড দি এইট্থের রাজ্য ত্যাগের ঘটনা মনে পড়ছে সুম্পষ্ট। মে মাস থেকে ব্রিটেনের সকল সংবাদপত্র জানতো সিম্পসন-এডোয়ার্ড প্রণয় কাহিনী। ফ্লিট স্ট্রীটে কানাঘুষায় শুনেছি বহুবার। কেউ প্রকাশ করেনি মুদ্রিতাক্ষরে। সরকারী দপ্তরের কোনো অনুশাসন ছিল না, ছিল না কোনো আইনগত বাধা। একদিন জার্মানির বিরুদ্ধে সেকেন্ড ফ্রন্ট হবে। কোথায়, কোনখানে করবে মিত্রশক্তি আক্রমণ সে-তথ্য জানা হয় তো সম্ভব হতে পারে স্টুয়ার্ট গেল্ডার, বা ড্রু পিয়ার্সনের। তাঁরা কদাচ প্রকাশ করবেন না সে সংবাদ, যদিও ক্রীপস প্রস্তাবের চাইতে সে কম বড় 'স্কুপ' নয়।

সকল প্রশ্নের বড় প্রশ্ন সততার। ক্রীপস আন্তরিক আবেদন জানিয়েছিলেন ব্রিটেন এবং ভারতের কল্যাণের নামে। আমরা সবাই সম্মতি দিয়েছিলাম বিনা প্রতিবাদে। পূর্ব প্রকাশের দ্বারা এই ভারতীয় সাংবাদিক ভঙ্গ করলেন সে-প্রতিশ্রুতি। তাই লজ্জিত বোধ করছি আমরা সমস্ত ভারতীয়েরা। জেন্টলম্যানরা যদি জার্নালিস্ট হতে পারেন, তবে জার্নালিস্টরা জেন্টলম্যান হতে পারবেন না কেন?

ভাইসরয়'স হাউস থেকে ক্রীপস এসেছেন তিন নম্বর কুইন ভিক্টোরিয়া রোডে। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য সার এণ্ড্রু ক্রো-র বাংলোয়। ক্রো আসামের আগামী গভর্নর। গদি দখলের

আগে ছ'মাসের ছুটি নিয়ে গেছেন মুসৌরী না কি আলমোড়ায়, বিশ্রাম মানসে।

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরদের বাড়িগুলি সরকারী। সুদৃশ্য। একতলা দালান। ঈষৎ পীতাম্ব রং; সামনে অতিবিস্তৃত অঙ্গন। এত বড় যে ছ'দিকে গোলপোস্ট খাড়া করে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ খেলা যায়। সবুজ ঘাস, লন্-মোর দিয়ে পরিপাটি ছাঁটা। মাঝখানে রক্তাকার ফুলের কেয়ারী। তাকে বেষ্টন করে টক্টকে লাল সুরকির রাস্তা; মোটর ঘোরাতে বেগ পেতে হয় না এতটুকুও। ফটকের গায়ে এক পাশে কাচের উপরে বড় হরফে লেখা বাড়ির নম্বর। কাচের একদিকে ছোট্ট একটু খুপরি। রাত্রিবেলায় তাতে লণ্ঠন জ্বলে রাখা হয়, অনেক দূর থেকেও যাতে বাড়ির নম্বরটা চোখে পড়ে। দালানের সম্মুখে পোর্চ, তার নীচে গাড়ি দাঁড়ায়। বারান্দার ছ'পাশে ছুটি ছোট কুঠুরি। সেখানে অনারেবল মেম্বারের সেক্রেটারী ও স্টেনোগ্রাফারের দপ্তর।

ছবছ একই ধরনের ছ'টি বাড়ি। সেক্রেটারিয়টের সম্মুখ থেকে দুই বাহুর মতো দুদিকে প্রসারিত দুটি রাস্তা—কিং এডওয়ার্ড ও কুইন্ ভিক্টোরিয়া রোডের উপরে। যেন ছ'টি যমজ ভাই, ডিয়োনি কুইন্টোপ্লেটসের দোসর।

আতিশয্যের দ্বারা অত্যন্ত ভালো জিনিষকেও যে কতখানি হান্ধকর করে তোলা যায় তার দৃষ্টান্ত আছে নয়াদিল্লীর নগর-পরিকল্পনায়। ইউনিফর্মটির বাতিকে পাওয়া স্থপতির। সহরটাকে শ্রী দিতে গিয়ে ছাঁচ দিয়েছেন, বাড়ি দিতে গিয়ে ব্যারাক্। বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে মূলগত ঐক্যকে প্রকাশ করার নাম সৃষ্টি। গজ, ফুট বা ইঞ্চি মিলিয়ে সামঞ্জস্য বিধানের নাম নকলনবীশী। প্রথমটা যিনি করেন তাঁকে বলি ব্রহ্মা, দ্বিতীয়টা যিনি করেন তাঁর নাম বিশ্বকর্মা। প্রথমটার মধ্যে আছে আর্ট, পরেরটার মধ্যে আছে ক্র্যাফট্।

পুরাকালে নগর-পত্তনের গোড়াতে ছিল নৃপতি। রাজার অবস্থিতি

ও অভিরুচি অনুসরণ করে গড়ে উঠত জনপদ, তাঁর প্রাসাদকে কেন্দ্র করে আমীর ওমরাহেরা তুলতো সৌধ, সাধারণেরা বাঁধতো বাসা, শ্রেষ্ঠীরা সাজাতো বিপণি। রাজশক্তির পতন অভ্যুদয়ের সঙ্গে রাজধানীর ভাগ্যে এসেছে বিপর্যয়, নগরনগরীর ঘটেছে বিলুপ্তি বা বৃদ্ধি। আগ্রা, আওরঙ্গাবাদ ও ফতেপুরসিক্রিতে আজও রয়েছে তার নিভুল নিদর্শন।

একালে রাজ্যের চাইতে বাণিজ্যের কদর বেশী। লেডী ডাক্তারের স্বামীর মতো রাজার মহিমাও এখন আর আপন বীর্যবত্তায় নয়, প্রজাদের বাণিজ্যবিস্তারে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, অন্তর্দেশেও এখন বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দেয় রাজদণ্ডরূপে—কখনও স্বনামে কখনও বা বেনামীতে। তাই এযুগের মহানগরীর centre of gravity থাকে ক্লাইভ স্ট্রিটে বা হর্নবি রোডে। তাদের প্রেরণার মূল চেম্বার অব প্রিন্সেস নয়, চেম্বার অব কমার্স। তাই ওয়াশিংটনের চাইতে নিউইয়র্কের গুরুত্ব হয় বেশী, লক্ষ্মীকে ছাপিয়ে ওঠে কানপুর, পাটনাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় টাটানগর।

আধুনিক ভারতবর্ষে নয়াদিল্লী হচ্ছে একমাত্র সিটি যেখানে স্টক এক্সচেঞ্জের প্রভুত্ব নেই। সেখানে বৈশ্য নেই। ব্রাহ্মণও না। আছে শুধু ক্ষত্রিয়। অবশ্য তাদেরও আয়ুধের পরিবর্তন ঘটেছে। মডার্ন ক্ষত্রিয়েরা অসিজীবী নয়, মসীজীবী। প্রাচীন ক্ষত্রিয়েরা ব্যুহ রচনা করে হাত পাকিয়েছিলেন। তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ব্যাস সবই রুলমাফিক্। আধুনিক ক্ষত্রবীরেরা ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে হাত এবং চুল ছুই-ই পাকিয়ে দেন, তারও নির্দেশ হলো precedent। সুতরাং নয়াদিল্লীর পথ, ঘাট, বাড়ি, ঘর সব কিছুই পিছনে আছে কেবলই এক রকম হওয়ার প্রয়াস। দোকান-পাট থেকে শুরু করে রাস্তা, পার্ক, কোয়ার্টার, মায় পথের পাশে জামগাছের সারি পর্যন্ত সব কিছুই যেন থাকী কোর্তা-পরা পন্টনের মতো সঙ্গীন উচিয়ে এটেনশনের ভঙ্গিতে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে।

নতুন আস্তানায় ক্রীপসের সভা বসলো পাত্র-মিত্র নিয়ে।
মক্সফোর্ডের অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড, এবং কানাডার সমাজতন্ত্রী গ্রেহাম
স্প্রাই আছেন তাঁর দপ্তরে।

কুপল্যাণ্ডের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একবার লণ্ডনের এক বিতর্ক-
নভায়। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর ঔৎসুক্য আছে যথেষ্ট, ঔদার্য আছে
কিনা জানিনে।

ক্রীপসের সঙ্গে একে একে সাক্ষাৎ করেছেন মোলানা আজাদ,
গান্ধীজি, পণ্ডিত নেহেরু ও মিস্টার জিন্না। আজাদের সঙ্গে দোভাষী
ইসাবে উপস্থিত ছিলেন আর এক জন কংগ্রেসী মুসলমান।
চারিস্টার, মিস্টার আসফ আলী। আসফ আলীর জন্মস্থান
বুদ্ধপ্রদেশ, কর্মস্থান দিল্লী, শ্বশুরবাড়ি বাংলায়। তাঁর স্ত্রী অরুণা
আসফ আলীর পৈতৃক উপাধি ছিল গান্ধুলী, অতি নিকট আত্মীয়
সম্পর্ক আছে রবীন্দ্রনাথের কন্যা মীরাদেবীর সঙ্গে।

পণ্ডিত জওহরলালের ইংরেজী জ্ঞানের খ্যাতি তাঁর দেশপ্রীতিরই
তো বহুবিদিত। জীবিত ইংরেজ সাহিত্যিকদের মধ্যেও তাঁর তুল্য
ইংরেজী রচনাকুশল বড় বেশী নেই, এ-কথা স্বীকার করেছেন বহু
ইংরেজ। গান্ধীজির ইংরেজী জওহরলালের ন্যায় সাহিত্য-প্রধান
নয়, কিন্তু তার স্বচ্ছতা ও অলঙ্কারহীন মাধুর্য বহুক্ষেত্রে বাইবেলের
ভাষাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মিস্টার জিন্না ছিলেন প্রথিতযশা
ব্যবহারজীবী। ইংরেজীতে সওয়ালে তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। ক্রীপসের
সঙ্গে একটি মাত্র লোক আলাপ করেছেন—ক্রীপসের ভাষায় নয়,
নেজের ভাষায়। ইংরেজীতে নয় উর্দুতে। যদিও কাজ চালাবার
তো ইংরেজী তিনি জানেন বলে জনশ্রুতি শুনেছি বহু বার।
মৌলিকতা আছে কংগ্রেসের মুসলিম সভাপতি মোলানা আজাদের।
তাঁর জয় হোক।

ইংরেজী আমাদের মাতৃভাষা নয়। কিন্তু ইংরেজী আমাদের
শেখতে হয়। তাতে ক্ষোভ নেই। হয়তো লাভই আছে।

স্বাভাৱিকতাৰ আধুনিক ধাৰণা, ইংৰেজীতে যাকে বলে গ্ৰামাৰ্গ্ৰামাইজম, তাৰ বেশীটা আমৰা পেয়েছি ইংৰেজী শিক্ষাৰ ফলে। কিন্তু এদেশে বিদ্যা, বুদ্ধি এবং কৰ্মকুশলতাৰ মাপকাঠিও দাঁড়িয়েছে ইংৰেজী বলা ও লেখাৰ কৃতিত্বে। এটা হাস্যকৰ। কলেজে পরীক্ষাৰ খাতায় যে ছেলে ভালো ইংৰেজী লেখে, চাকুরীৰ বাজাৰ থেকে বিবাহযোগ্য কন্যাৰ উদ্বিগ্না জননী পর্যন্ত সৰ্বত্র তাৰ আদৰ আছে। এ-দেশেৰ নেতাদেৰ সম্পৰ্কেও তাই বিদেশী পর্যটকেৰা যখন বলে যে he speaks faultless English আমৰা তখন আনন্দে গদগদ হই। এই মনোভাৱেৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাপেক্ষা সতেজ প্ৰতিবাদ আছে মৌলানা আজাদেৰ আচৰণে। ক্ৰীপসই হোক, ভাইসরয়ই হোক, কিন্ধা স্বয়ং জৰ্জ দি ফিফ্থই হোক, যদি আমাৰ সঙ্গে আলাপ কৰতে আমাৰ ভাষা না বলতে চায় বা না পাৰে তবে আমিই বা তাৰ ভাষা বলতে যাবো কেন? সাবাস্!

গান্ধীজি ক্ৰীপসেৰ কক্ষ থেকে নিষ্কান্ত হলেন প্ৰায় তিন ঘণ্টা পরে। তাঁকে বারান্দাৰ সিঁড়ি অবধি এগিয়ে দিতে সঙ্গে এলেন ক্ৰীপস্। মুহূৰ্তমধ্যে সাংবাদিকেৰা চক্ৰবাহু রচনা কৰলেন তাঁকে ঘিৰে। চোখে তাঁদেৰ জিজ্ঞাসা, মুখে তাঁদেৰ আগ্ৰহ, উত্তেজনা ও উদ্বিগ্নেৰ ছাপ। স্মিতহাস্তে উদ্বেলিত জনতাকে অভ্যর্থনা কৰলেন তিনি। বিনাবাক্যে নিরস্ত কৰলেন বহু উত্তত প্ৰশ্ন।

ক্ৰীপসেৰ রসবোধ আছে। রহস্য কৰে বললেন, গান্ধীজিৰ হাসি দেখে সাংবাদিকেৰা যেন ক্ৰীপস প্ৰস্তাবেৰ গুণ বিচাৰ না কৰেন। ঘৰ থেকে বেরোবাৰ সময় মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে তিনি গান্ধীজিকে শিখিয়ে দিয়েছেন। প্ৰবল হাস্যধ্বনি উত্থিত হলো এই কৌতুকালোপে।

কিন্তু কাশীৰ পাণ্ডা, বিয়েৰ ঘটক ও বীমাৰ দালালেৰ চাইতেও নাছোড়বান্দা আছে জগতে। তাৰ নাম ৰিপোৰ্টাৰ। গান্ধীজিৰ আলোচনা সম্পৰ্কে জানতে চাইলেন তাঁৰা। অঙ্গুলি নির্দেশে

ক্রীপসকে দেখিয়ে উত্তর করলেন মহাত্মা, “ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার কিছুই বলার নেই।”

“প্রস্তাবটি এমনই চীজ যে, দেখেই আপনি হতবাক্?” প্রশ্ন করলেন এক ঝাঙ্কু সাংবাদিক।

“You naughty boy” বলে প্রসন্ন হাস্তে সমাপ্তি ঘটালেন আলোচনার। মোটরে উঠে যুক্তকরে অভিবাদন করলেন উপস্থিত জনমণ্ডলীকে। প্রস্থান করলেন বিড়লা ভবনোদ্দেশে।

ইনফরমেশন বিভাগের ক্যাম্প হয়েছে পাশের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে, সাংবাদিকদের সুবিধার্থে। সেখানে হানা দিচ্ছি আমরা রিপোর্টারের দল প্রত্যহ প্রাতে, দুপুরে, বিকালে ও সন্ধ্যায় অমিত উৎসাহে। যদিও কবে কখন কোন ভারতীয় নেতা ক্রীপসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন তার বেশী আর কিছুই জানার উপায় নেই সেখান থেকে।

ক্যাম্প অফিসের কর্তা জগদীশ নটরাজন, ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মারের প্রতিষ্ঠাতা বম্বের বিখ্যাত সাংবাদিক কে, এস, নটরাজনের পুত্র। পাইওনীরের সম্পাদকগোষ্ঠী থেকে এসেছেন গভর্নমেন্টে। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের তথ্য জানেন অনেক, ইংরেজী বলেন স্বচ্ছন্দে, উচ্চারণে নেই মদ্রজনোচিত ধ্বনিবিকৃতি। একদিন নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল তাঁর গৃহে।

নটরাজন গৃহিনী মাদ্রাজী নন,—এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। তাঁর পিতৃকুল বব্ পরিবারের খ্যাতি আছে টেনিস খেলায়, মাতৃকুলের মূল অনুসন্ধান করা যায় বঙ্গদেশে। তাঁর মাতামহী ব্যানার্জীকণ্ঠা ছিলেন, সে হিসাবে বল্লাল সেনের সৃষ্ট কৌলীণ্যে দাবী আছে। পিয়ানো বাজাতে পারেন চমৎকার।

আধুনিক অনেক প্রগতিশীল বাঙ্গালী পরিবারেরও ভারতীয় রূপটি খুব স্পষ্ট নয়। গৃহের কর্তা হয়তো বিদ্যার্জন করেছেন বিদেশে। অক্সফোর্ডে ইংরেজী, গ্রাসগোতে এঞ্জিনীয়ারিং, এডিনবরায় ডাক্তারী বা লিঙ্কনস্ ইনে ব্যারিস্টরী পড়ে দেশে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন

কর্মজীবনে, অর্থার্জন করছেন অজস্র ধারে। তাঁদের বসনে স্যুট, অশনে স্লুপ এবং আসনে কোচ। তাঁদের গৃহিনীরা পার্টি দেয়, ক্লাবে যায়, ব্রিজ খেলে পুরুষ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে অসঙ্কোচে। সে গৃহে চাকরেরা বয়, মায়েরা মেমসাব এবং মেয়েরা মিসিবাবা।

বিলাতে না গিয়ে যাঁরা সাহেব তাঁরা আরও দুর্ধর্ষ। কংগ্রেস থেকে লীগে যোগ দেওয়া মুসলমানের মতো, হিরোডকে করেন আউট হিরোড। স্লিপিং পায়জামা না পরে ঘুমানো বা ছুরি কাটা দিয়ে না খাওয়াকে তাঁরা প্রায় মধ্য যুগের গঙ্গায় সম্ভ্রান্ত বিসর্জন বা সতীদাহের ন্যায় রোমহর্ষক বর্বরতা জ্ঞান করে থাকেন। তবুও একথা মানতেই হবে যে ইংরেজ অথবা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বিয়ে করে আমরা আমাদের সংস্কৃতির মূল থেকে যেমন নিঃশেষে উৎপাটিত হই এমন আর কিছুতেই নয়। বাঙ্গালী গৃহিনীরা যতই চুল খাটো করুক, গিমলেট গিলুক, রংকরা ঠোঁটের মধ্যে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ফিরিঙ্গী উচ্চারণে ভুল ইংরেজী বলুক, সংস্কার থাকে Coty বা ম্যাকস্ফ্যাক্টর ঘষা চামড়ার তলায়। রক্তে থাকে ঠাকুমা দিদিমাদের অন্ধ বিশ্বাসের রেড কর্পাসল। তাই মেয়ের বিয়ের দিন ঠিক করতে খোঁজ পড়ে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার, স্বামীর অশ্রুখে লুকিয়ে মানত করেন সুবচনী, ছেলের কল্যাণ কামনায় ষষ্ঠীর দিনে থাকেন উপোস। পুরুষেরা হোটেলের যতই খান স্টেক বা ভিল, মা-বাবার শ্রদ্ধ করেন গুরু পুরোহিত ডাকিয়ে যথারীতি।

সব চেয়ে দুর্ভাগা ভারতীয় ও যুরোপীয় জনক জননীর সম্ভ্রান্তেরা। তারা পিতার সমাজ থেকে বিচ্যুত, মাতার সমাজ দ্বারা বর্জিত। তারা না ভারতবর্ষের, না ইংলণ্ডের। কোন দেশের প্রতি তাদের দেশাত্মবোধ জাগবে, কোন জাতির প্রতি মমত্ববোধ? তারা বাবার কাছে পাবে নামের পদবী, মায়ের কাছে থেকে পাবে গায়ের রং, কার কাছে থেকে পাবে মনোভাব? তারা সত্যিকার বর্ণসঙ্কর, শুধু জন্মে নয়, আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে। ভারতীয়-য়ুরোপীয়ের বিবাহজাত

দস্তানেরা আজ পর্যন্ত হয়নি কোন উঁচু দরের শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক বা সঙ্গীতজ্ঞ। তাদের দৌড় বড় জোর রেলের বড় সাহেব নয় তো টেলিগ্রাফের ডিরেক্টর।

যুরোপের সমাজ অনেকটা সার্বজনীন। ইংলণ্ড থেকে ইটালী পর্যন্ত মোটামুটি তার একই রূপ। ইংরেজ, ফরাসী, চেক, হাঙ্গেরিয়ানের প্রায় একই বেশ, একই পরিবেশ, একই আচার-আচরণ। সমগ্র যুরোপে লোক ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার ও সাপারে বসে ঘড়ি ধরে, খায় ছুরি কাটায়। থিয়েটারে যায় শনিবার রাত্রে, গির্জায় জানু পেতে ভজনা করে রবিবারে। ভাষার বিভেদ ছাড়া যুরোপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে সামাজিক মিল আছে সর্বত্র। লণ্ডনে ইংরেজ স্বামীর অস্ট্রিয়ান স্ত্রীকে দেখেছি অন্য আর পাঁচজন ইংরেজ গৃহিণীর মতো অনায়াসে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। স্বামী, পুত্র, কন্যা নিয়ে তার গৃহের সঙ্গে অন্য আর পাঁচটি ইংরেজ পরিবারের নেই তফাৎ। ছেলে মেয়েরা বেড়ে উঠছে ঠিক অন্য আর পাঁচটি ডিক, পল বা হ্যারিংটন পুত্র-কন্যার মতো। অবশ্য সমস্তা যে একেবারে নেই, তা নয়। সে সমস্তা প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যক্ষ-গোচর নয়, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষণে দেখা দেয় স্বামী-স্ত্রীর মনে। যেমন, লর্ডসে টেস্ট ম্যাচের সময় কোন্ পক্ষের এ্যশেজ লাভ কামনা করবে ইংরেজ স্বামী আর অস্ট্রেলিয়ান স্ত্রী? মহাযুদ্ধে, কার জয়লাভে উৎফুল্ল হবে জার্মান মিস্টার, কোন্ পক্ষের পরাজয়ে মুহূর্তমান হবেন তাঁর রাশিয়ান মিসেস?

তবুও দূর ভবিষ্যতে কোনো দিন ইউনাইটেড স্টেটস অব যুরোপ যদি গড়ে ওঠে, যদি সম্ভব হয় এক কথ্য ভাষা, তবে কল্পনা করা কঠিন নয় যুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অধিকতর বৈবাহিক যোগাযোগ। তখন স্পেনের তরুণ হামেশা বিয়ে করবে নরওয়ের তরুণী ঠিক যেমন এখন করে স্কচেরা ওয়েলসের। যেমন আমাদের কোল্লগরের কনে'কে ঘরে নিয়ে আসে, বরিশালের বর।

ভারতীয় ও যুরোপীয় জীবনের মর্ম আলাদা, সমাজের গঠন বিভিন্ন। একান্নবর্তী পরিবারের কথা বাদ দিলেও আমাদের সমাজ কেবল ব্যক্তি ও তার স্ত্রী পুত্রের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। বহু আত্মীয় ও পরিজনগোষ্ঠীর প্রতি নানাবিধ দায়িত্ব এবং সম্পর্কের দ্বারা তার প্রভাব ও ক্ষেত্র দূরপ্রসারিত। তাই পূর্ব ও পশ্চিমের বৈবাহিক যোগাযোগে ব্যক্তিগত জীবন সুখের হওয়া হয়তো বিচিত্র নয়, কিন্তু তা দ্বারা কোনকালে ঘটবে না দুই মহাদেশের সামাজিক মিলন। যুরোপের স্ত্রীলোক মাত্রই আমাদের পক্ষে পরস্ত্রী।

নটরাজনের ভোজ সভায় পরিচয় ঘটলো এক মারাঠী ব্রাহ্মণের সঙ্গে। বয়স চল্লিশের অনেক উপরে, মাথায় কালোর চাইতে সাদার ছোপ বেশী, বলিষ্ঠ দেহ, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসা। সব চেয়ে আশ্চর্য তার চোখ দুটি। দীর্ঘায়ত নয়ন, অবনী ঠাকুরের আঁকা ভারতীয় চিত্রকলার অর্জুনের মতো। তাতে অপরিসীম ক্রান্তির ছাপ। দৃষ্টিতে বুদ্ধির দীপ্তি আছে বটে, কিন্তু তাকে ছাপিয়ে আছে আঘাটের জলভারনত ঘন মেঘের মতো কালো গভীর ছায়া। সাধারণতঃ চোখে পড়ে না পুরুষের এমন অসাধারণ চোখ।

কিন্তু নয়। দিল্লীর সোসাইটিতে চারুদত্ত আধারকারের খ্যাতি পানীয়ঘটিত। এক বৈঠকে তিনি দশ পেগ ইইস্কি পান করতে পারেন অবলীলাক্রমে। চোখের পাতা কাঁপবে না এতটুকু। সেটা অভূতপূর্ব নয়। আরও দু'চার জন পারেন তা। কিন্তু আধারকারের কৃতিত্ব শুধু পানীয়ের গ্রহণে নয়, উদ্ভাবনেও। সংখ্যাতে মিস্কিং জানা আছে চারুদত্তের। ককটেল তৈরীর বহু পদ্ধতি তাঁর নখাগ্রে। ডিনারে, পার্টিতে নিমন্ত্রণকারিণীরা আগে ভাগে পরামর্শ করেন আধারকারের সঙ্গে। মহানন্দে মন্ত্রণা দেন তিনি। “কে কে আসছে, কতজন আসছে? যদি তিন রাউণ্ডেই ঘায়েল করতে চাও, তবে প্রথমে দাও রাম-অরেঞ্জ, তারপরে জিন এণ্ড লাইম। তারপরে ইইস্কি। মেয়েদের জন্য মাঝখানে ব্র্যাণ্ডি দিতে পার’

গারেলের সঙ্গে মিশিয়ে। কী বললে, রাম-অরেঞ্জ কেমন করে' হবে জানো না? হোয়ট এ পিটি! আচ্ছা শিখিয়ে দিচ্ছি। haker এর মধ্যে সিকি ভাগ দাও ইটালীয়ান ভামু'থ। ইটালীয়ান নই? আচ্ছা অভাবে ফ্রেঞ্চই দাও। মেশাও সিকি ভাগ ফমলালেবুর রস, অর্ধেক ঢালো রাম। বেশী করে বরফ, আর সামান্য একটু দারচিনির রস। ব্যস। আচ্ছা করে মিশিয়ে এবার ককটেল গ্লাসে পরিবেশন কর।”

নটরাজন গৃহিণী বললেন, “মিনি সাহেব, (আমার মিনি সাহেব নামটা সেন সাহেবের অন্তরমহল থেকে বাহির বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে বন্ধুজনের সকৌতুক সম্বোধনে) যদি নতুন নতুন ককটেল খাতে চান তো মিঃ আধারকারের বুদ্ধি নেবেন”।

স্মিত হাস্তে আধারকার বললেন, “হ্যাঁ, চাকরী থেকে রিটায়ার করে আমার রেসিপিগুলোর পেটেন্ট নেবো ভাবছি। কাগজে গগজে বিজ্ঞাপন দেবো—If it's a drink, consult আধারকার। রে ঘরে মিসেস বিটনের মতো নতুন গৃহিণীদের আলমারীতে থাকবে আধারকার'স্ বুক অব ড্রিন্‌ক্‌স্।”

কিন্তু আমার জন্তে এ সবের চেয়েও বড় বিষয় অপেক্ষা করছিল। ভাজন পর্বের শেষে অতিথিদের সনির্বন্ধ অনুরোধে বেহালা বাজিয়ে গানালেন আধারকার। দরবারী কানেড়ার সুর। গৎ নয়, শুধু গালাপ। প্রায় মিনিট কুড়ি ধরে বাজালেন অপূর্ব দক্ষতায়। বাজনা শেষে আমার পানে তাকিয়ে বললেন, “বলতে পারো কী সুর বাজালেম, মিনি সাহেব?” বিষ্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেম খানিকক্ষণ, গুত্তর দেওয়ার কথাই মনে রইল না। পরিষ্কার বাংলা।

“কী, একেবারে থ' হয়ে রইলে যে?” এবারও বাংলায়।

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললাম, “আপনি আশ্চর্য। বাংলা শুনলেন কেমন করে?”

“এ কি একটা প্রশ্ন? তুমি ইংরেজী শিখেছ কেমন করে?”

“আমি শিখেছি পেটের দায়ে।”

“আমি শিখেছি প্রাণের দায়ে। না, না, আর প্রশ্ন নয়,
Curiosity is a feminine vice”

বিদায় নেওয়ার আগে আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন “মিনি সাহেব, ‘তুমি’ বলচি বলে চটোনি তো মনে মনে? তুমি তো বয়সে অনেক ছোটই হবে। আমি থাকি রটেগুাম রোডে, ২২ নম্বর। এস একদিন সন্ধ্যাবেলা, বাংলা বলবো, বেহালা শোনাবো, আর দেব টপ-হ্যাট। টপ-হ্যাট জানো তো? জানো না? অর্ধেক জিন্, সিকিভাগ ফ্রেঞ্চ ভারমুখ, সিকিভাগ ইটালীয়ান। একফোঁটা বিটাস, তার সঙ্গে খুব খানিকটা বরফ।

আধারকারের বাড়িতে একদিন গেলাম। টপ-হ্যাটের লোভে নয়, লোকটির আশ্চর্য আকর্ষণে। একদিন গেলাম, দুদিন গেলাম। তারপর প্রত্যহ। কখনও বা সকালে এবং বিকালে। অনেকদিন ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে ডিনার পর্যন্ত সবই সমাধা হলো তার ওখানে। অল্প সময়ে আন্তরিকতা এত ঘনিষ্ঠ হলো যে, আধারকার পুরুষ না হলে নিন্দুকের কুৎসারটনায় কলঙ্কিত হতে পারতো আমার নাম। তার বিবাহযোগ্য কন্যা থাকলে নয়াদিল্লীর গৃহিণীরা সম্ভবপর বর কল্পনা করে মুখরোচক আলোচনায় অবসর বিনোদন করতে পারতেন অলস মধ্যাহ্নে।

কিন্তু কন্যা দূরে থাক, কন্যার জননীর চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না অকৃতদার আধারকারের গৃহে। গোটা তিন চার চাঁকর, বেয়ারা, খানসামা নিয়ে আধারকারের হোম গভর্নমেন্ট। তার একমাত্র রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টের ভার তার নিজের, বাকী এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেটিভ, মায় জুডিশিয়ারী পর্যন্ত সমস্তটাই চাকরদের হাতে। ঋণটি প্রজাতন্ত্র। মজাতন্ত্র বললেও ক্ষতি নেই, ভৃত্যদের পক্ষে।

তর্ক চলে, আলোচনা হয়। রাজনীতি, ধর্ম, ওয়র স্ট্র্যাটেজী, মায় সিনেমা স্টার পর্যন্ত কোন বিষয়ই বাদ পড়ে না। মাঝে মাঝে

হয় কাব্যালোচনা। রবি ঠাকুরের বহু কবিতা ও কবিতাংশ
আধারকারের কণ্ঠস্থ। গম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করেন—মন দেয়া নেয়া
অনেক করেছি মরেছি হাজার মরণে, নৃপূরের মতো বেজেছি
চরণে চরণে।” আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, বল কোথায়
আছে? বলতে পারলে বলেন, সাবাস্! Now you have
earned a drink নাও একটা অরেঞ্জ গিমলেট—খানিকটা জিন,
কমলালেবুর রস। এই বয়, সাবকোবাস্তে—”। কোন দিন বলেন,
আজ পরীক্ষা। বল কোথায় আছে—“আমারে যে ডাক দেবে
গারে বারম্বার এ জীবনে ফিরেছি ডাকিয়া; সে নারী বিচিত্র বেশে,
মুহূ হেসে, খুলিয়াছে দ্বার থাকিয়া থাকিয়া।”

পারলে না? আচ্ছা আর পাঁচ মিনিট সময় দিলুম। তবু
পারলে না, হাঃ হাঃ, বাঙালী হয়ে বাংলা কবিতার বাজিতে
অবাঙালীর কাছে হারলে। লোকে শুনলে বলবে কী হে? আচ্ছা
আগে মাথা সাফ্ করে নাও। বয়! লাও একঠো ক্রকুলীন।
একটা টাঙ্গলারে অর্ধেকটা বরফের টুকরো, কিছুটা ফ্রেঞ্চস্টাইল
ভারমুখ্, কিছুটা ড্রাই-জিন্। আচ্ছা করে নেড়ে দুফোঁটা অরেঞ্জ
বিটাস্। ডিল্লিসস্।

একদিন জিজ্ঞাসা করেন, “মিনি সাহেব, প্রেমে পড়েছ কখনও?”

“না।”

“বল কী হে, ইয়ং ম্যান, বিলেতে ছিলে, প্রেমে পড়নি, একথা
বিশ্বাস করবে কে?”

“বিশ্বাস করা উচিত। There are more things in
heaven and earth...”

“কিন্তু There are more girls in Piccadilly and
Licester Square ওতো বটে।”

“আসল কথা কী জানেন? প্রেমে পড়লে চেহারাটা বড্ড বোকা
বোকা দেখায়, সিনেমায় দেখেছি। সে ভয়ে এগোতে সাহস করিনি।”

উচ্চ হাস্যে ফেটে পড়লেন আধারকার। বোকা বোকা দেখায়, হাঃ, হাঃ হাঃ, Just imagine প্রেমে না পড়ার কারণ—বার্নার্ড শ, এর চাইতে ভালো কিছু বলতে পারতেন না। You are a genius না, তোমাকে আজ নতুন কিছু না দিতে পারলে মান থাকে না। try রাম ক্রইয়ট। চার চামচে রাম, এক চামচে লাইম, এক রক্তি চিনি, আধ পেয়ালা ব্ল্যাক কফির সঙ্গে মিশিয়ে। ওয়াগারফুল।

দিনের পর দিন বাড়ে বিশ্বয়। ক্রমশঃ আকৃষ্ট হই এই মারাঠা ব্রাহ্মণের প্রতি। আশ্চর্য এর জীবন। কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে গভীর এর অনুরাগ, বেহালা বাদনে অসাধারণ এর দক্ষতা। আয় করেন প্রচুর, ব্যয় করেন প্রচুরতর। বেশীর ভাগই মদ খাওয়া এবং খাওয়ানোয়। অথচ অশোভন আচরণ করতে দেখিনি কখনও। দস্ত করে বলেন, মিনি সাহেব, তোমাদের শরৎ চাটুয্যে লিখেছেন, —যে মদ খায় সে কোন দিন না কোন দিন মাতাল হয়েছে নিশ্চয়। যে অস্বীকার করে, সে হয় মিছে কথা বলে, নয় তো মদের বদলে জল খায়। শরৎ চাটুয্যে দেখেননি চারুদত্ত আধারকারকে। দেখলে বই থেকে ঐ লাইন দুটি তুলে দিতেন।

শ্রী নেই আধারকারের সে-কথা সবাই জানে। কিন্তু আ পুরিজন? কারও জানা নেই কোন তথ্য। হাসিতে খুশীতে, গল্পে, গুজবে, সরগরম রাখেন মজলিশ, মুখরিত করেন নিজ গৃহের প্রাত্যহিক বন্ধুসমাগম। তবু চোখের দিকে তাকালে মনে হয়, এহ বাহ্য এক গভীর দুঃখের ভার পুঞ্জীভূত হয়ে আছে ঐ ভাবানত নয়নের অন্তরালে, নিঃসঙ্গ জীবনের পশ্চাতে আছে অপরিসীম বেদনার ইতিহাস। কিন্তু কোশলে প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে আবৃত্তি করেন আধারকার,

{ আমারে পাছে সহজে বোঝ তাইতো এত লীলার ছল ;
বাহিরে যার হাসির ছটা ভিতরে তার চোখের জল। }

ছয়

ইংরেজীতে একটা চলতি কথা আছে, দু'জন ইংরেজ একত্র হলে গড়ে একটা ক্লাব, দু'জন স্কচ একত্র হলে খোলে একটা ব্যাঙ্ক, দু'জন জাপানী করে একটা সিক্রেট সোসাইটি। দু'জন বাঙালী একত্র হলে করে কী? দলাদলি? তা করে এবং বোধ হয় একটু বেশী মাত্রায়ই করে। কিন্তু তা' ছাড়া আরও একটা জিনিষ করে। স্থাপন করে একটি কালীবাড়ি। উত্তর ভারতের এমন সহর দু'ঘট যেখানে বাঙালী আছে কিছুসংখ্যক অথচ কালীবাড়ি নেই একটি।

হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে কালী মূর্তিটি সুখদৃশ্য নয়। বীণাবাদিনী সরস্বতীর সুষমা বা কমলাসনা লক্ষ্মীর শ্রী নেই তার মসীকৃষ্ণ দেহে। ভগবতী দুর্গার হাত দশটি, প্রহরণ সমপরিমাণ। কিন্তু কালীমূর্তির কাছে তাঁকেও অনেক শান্ত ও সুকুমার মনে হয়। কণ্ঠে তাঁর নরমুণ্ডের মালা, কটিতে তাঁর ছিন্ন বাহুর গুচ্ছ, একহাতে ধৃত মুক্ত কুপাণ, আর হাতে দোলে খণ্ডিত শির। অতি বিস্তৃত আননের কোনোখানে নেই কমনীয়তার লেশমাত্র আভাস, নয়নে নেই স্নিগ্ধনত দৃষ্টি। নিরাবরণ বক্ষ, নিরাভরণ দেহ, লোলায়িত রসনা। স্বদেশীয় ভক্তরা বলেন, মা ভয়ঙ্করা; ক্যাথারিন মেয়ো বই লিখে বলেন, বীভৎস।

এই রুদ্র ভয়াল মূর্তিকে ভালোবাসে বাঙালী। শ্রীচৈতন্য যে ভক্তি শ্রোত আনলেন তার চিহ্ন রইল একটি মাত্র বিশেষ শ্রেণীতে। কালীর ভক্তরা আছেন দেশব্যাপী। শুধু শাক্তদের মধ্যেই তাঁর পূজারীরা নিবদ্ধ নয়। তাঁর পূজা নিরক্ষর গ্রাম্য কৃষকের কুটীর থেকে ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। পুরাকালে কাপালিকেরা

শবাসনে সাধনা করেছে দেবী কালিকার, তান্ত্রিকেরা আরাধনা করেছে শ্রামামায়ের, দস্যুদল লুণ্ঠন মানসে নির্গত হয়েছে রুমুণ্ড-মালিনী কালীর অর্চনা করে। আধুনিক যুগেও অসুস্থ আত্মীয়ের আরোগ্য কামনায় বাঙালী মেয়েরা মানৎ করেন মা কালীর কাছে, পল্লীতে মহামারী দেখা দিলে সরলচিত্ত অধিবাসীরা পূজা করে ভক্তিভরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁরই সাধনা করেছেন দক্ষিণেশ্বরে, তাঁরই ধ্যান করেছেন সাধক রামপ্রসাদ ;—রচনা করেছেন অপূর্ব শ্রামা-সঙ্গীত।

বাঙালীর পক্ষে এই কালীপ্রীতি আপাতঃদৃষ্টিতে কিছুটা বিষয়কর মনে হবে। তাঁর শারীরিক সামর্থ্য এবং মানসিক গঠন বাঙালীকে আকৃষ্ট করবে কোমলতার প্রতি, স্নিগ্ধতার প্রতি, মাধুর্যের প্রতি,— এইটেই আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু বাঙালীকে যঁারা ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, তার প্রকৃতিকে যঁারা যথার্থরূপে অনুশীলন করেছেন তাঁরা জানেন এই আপাতঃবিরোধিতাই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কুসুমের মৃদুতা এবং বজ্রের কাঠিন্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তার প্রকৃতিতে। তাই ভীরুতার অপবাদ যেমন তার বহু-প্রচারিত, চরম দুঃসাহসিকতার জয়তিলকও তারই ললাটে। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের সংঘাত ও সংঘর্ষ আজ বহু-ব্যাপ্ত, আসমুদ্র-হিমাচল তার বিস্তার ও বেগ। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার এই সুদীর্ঘ সংগ্রামে যোগ দিয়েছে জাতি ধর্মনির্বিশেষে সর্ব প্রদেশের সর্বসাধারণ। মারাঠী এসেছে, মাদ্রাজী এসেছে, এসেছে গুজরাতী, পার্শী ও বেহারী। ভরেছে জেল, সয়েছে নির্যাতন। কিন্তু স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহায় বাঙালীই সাধন করেছে অগ্নিমন্ত্রের, দিয়েছে, দক্ষিণা, জীবন দিয়ে পরিশোধ করেছে দেশমাতৃকার ঋণ। একমাত্র বাংলা ছাড়া ভারতবর্ষের কোথায় স্কুলের ছেলে বরণ করেছে ফাঁসি, মেয়েরা ছুঁড়েছে পিস্তল, পলিতকেশ অস্ত্রঃপুরিকা বুক এগিয়ে নিয়েছে গুলির আঘাত ?

রিডিং রোডের উপর যে কালীমন্দিরটি স্থাপিত হয়েছে মিলিত

উদ্যোগ ও আর্থিক প্রচেষ্টায়, তার জন্ম নয়াদিল্লীর বাঙালী সমাজের গর্ব করার অধিকার আছে। আত্মঘাতী বুদ্ধির কর্মনাশা হঠকারিতায় সে কেবলই করে কলহ, ঘটায় ভেদ, ধ্বংস করে প্রতিষ্ঠান,—এ অপবাদ বাঙালীর। বোধ হয় একেবারে অমূলকও নয়। একক প্রচেষ্টায় বাঙালীর কৃতিত্ব তুলনাহীন। তার মেধা, তার ঋদ্ধি, তার নৈপুণ্য সর্বজন-স্বীকৃত। কিন্তু বহুজনের সম্মিলিত কর্ম দ্বারা একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার যথেষ্ট শক্তি দেখায়নি বাঙালী,—একথা গভীর পরিতাপের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়। তাই এই কালীবাড়িটি দেখে মন খুশী হয়। কোনো রাজন্যবাক্তির অনুগ্রহে নয়, নয় কোনো বিভ্রাটের একক অর্থানুকূল্যে, প্রবাসী বাঙালীদের প্রদত্ত ও সংগৃহীত চাঁদায় গড়ে উঠেছে এই মন্দির, স্থাপিত হয়েছে বিগ্রহ।

সরকারী দপ্তরখানায় জীবিকার্জনের তাগিদে উত্তর ভারতের এই মহানগরীতে এসেছে বাঙালী। তাদের কেউ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যরূপে আয় করেছেন প্রচুর অর্থ, কেউ সাধারণ কেরানীর কাজে পেয়েছেন পরিমিত বেতন। তাঁরা সবাই দিয়েছেন দান,—স্বেচ্ছায় ও শ্রদ্ধায়। অল্প অল্প করে জমেছে অর্থ, ভরেছে দেবীর ভাণ্ডার। সাধুবাদ দিই তাঁদের। তাঁরা ধন্য।

মন্দিরটির পরিকল্পনা করেছেন যে স্থপতি তাঁর নাম জানিনে, কিন্তু প্রশংসা করি। আড়ম্বরহীন, বাহুল্য-বর্জিত, সহজ, সরল গঠন। বড়বাজারের গন্ধ নেই, নেই মার্কিনী ঢংএর অতি আধুনিক স্ট্রীমলাইন। দূর থেকে দেখে চোখ তৃপ্ত হয়, কাছে গেলে মনে শুচিতার উদ্বেক ঘটে।

গুটি কয়েক সোপান অতিক্রম করে উপরে উঠলে বিস্তৃত অলিন্দ, ঈষৎ উচ্চ জালিকাটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে মন্দির, চারদিক ঘিরে পথ। সেপথে দর্শনার্থীরা প্রদক্ষিণ করে বিগ্রহ, দ্বারে লম্বমান ঘণ্টা-ধ্বনি করে মন্দিরের ধূলি নেয় মাথায়। আপন অন্তরের কামনা নিবেদন করে ভক্ত নরনারীর দল। আকাশের আলো এবং বাইরের

বাতাস আসতে বাধা নেই এতটুকুও। মন্দিরের অভ্যন্তরে নেই অন্ধকার, নেই পুষ্পপত্র ও গজোদকের দ্বারা আর্দ্র অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়া।

মন্দিরের প্রাঙ্গণটি সুপরিসর। একদিকে আরাবল্লী পর্বতের রীজ। পাথরের খাড়া দেয়াল, সিমেন্ট দিয়ে জোড়া। অন্যদিকে রাস্তা এবং রেলিং। পিছনে এক কোণে পুরোহিতের বাসস্থান। ছোট্ট একটি কোয়াটার, মন্দির কতৃপক্ষের তৈরী।

দূরদেশে দেবীর নিয়মিত পূজার আয়োজনে পুরোহিত সংগ্রহ খুব সহজ নয়। বাংলা থেকে কাউকে এনে রাখতে হলে চাই তাঁর জন্য নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা। তাঁর পরিজন প্রতিপালনের নিশ্চিত আশ্বাস। তাই মন্দির কতৃপক্ষ পুরোহিতের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন মাসিক মাসোহারা। তার গ্রেড আছে, ইনক্রিমেন্ট আছে, ছুটির ব্যবস্থা আছে। আছে প্রণামী, দর্শনীর প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত। এযুগে দেব-সেবককেও চাকুরীর ফাণ্ডামেন্ট্যাল রুলস্ মেনে চলতে হয়।

মানুষের জীবন যখন জটিল হয়নি, তখন তার অভাব ছিল সামান্য, প্রয়োজন ছিল পরিমিত। সে-দিনে ব্রাহ্মণের পক্ষে আবশ্যিক ছিল না বিস্তার। সে বিদ্যাদান করতো ছাত্রকে, জ্ঞান দান করতো শিষ্যকে, ভজন পূজন করতো নিশ্চিত্ত নির্বিশ্বে। সে নিলোভ, নিরাসক্ত শুদ্ধাচারী, সাত্ত্বিক। সে-দিন বিগত, তার সঙ্গে সে ব্রাহ্মণও তিরোহিত। একালে পুরোহিতেরও সংসার যাত্রার উপকরণ হয়েছে বৃদ্ধি। তার স্ত্রীর জন্য চাই সায়া, সেমিজ ও রাউজ, ছেলের জন্য মেলিনস ফুড, মেয়ের জন্য হেজলীন স্নো। ইহকালের সমাজ, সংসার ও পারিপার্শ্বিকের প্রতি উদাসীন হয়ে শুধু যজমানের পরকালীন মঙ্গল চিন্তা করলে তার নিজের পরকাল ঘনিয়ে আসে। তাই মন্দিরের পূজারীর জন্য রাখতে হয়েছে বিনা ভাড়ায় বাসস্থান, তাতে বিজলী আলো আছে, কলের জল আছে, আছে ভদ্র স্বল্পবিত্ত বাঙালী পরিবারের উপযোগী সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন।

সিঁড়ির পাশে জুতা খুলে রেখে উঠলাম মন্দিরে। অকুপণভাবে

পুরোহিত দিলেন দেবীর পাদোদক, দিলেন নির্মাল্য ও প্রসাদ-কণিকা। কলকাতার মতো মন্দির প্রাঙ্গণে স্টুটপরা বাঙালীর উপস্থিতি এখানকার সমাজে পরিহাসের উদ্রেক করে না। কারণ বসনকে এখানে ব্যক্তির পরিধেয় বলেই গণ্য করে, মনোভাবের পরিচয়রূপে নয়। এটি সম্ভব হয়েছে শুধু সহরে বিভিন্ন পরিচ্ছদের মানুষের অবস্থিতির ফলে। এখানে মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ, পাঞ্জাবী সিং, মহারাষ্ট্রীয় বাঈ, বাঙালী বিধবা আসে প্রণাম নিবেদনে। তাদের বেশ, ভূষা, এমন কি বস্ত্র পরিধানের রীতি নীতি সমস্তই বিভিন্ন। তারা ভক্ত, এইটেই তাদের একমাত্র পরিচয়, পরিচ্ছদটা তাদের শীত, আতপ ও নগ্নতা নিবারণের উপকরণ মাত্র।

মন্দিরের সামনে উন্মুক্ত প্রান্তর। সেখানে শরৎকালে ত্রিপলটাকা মণ্ডপে দুর্গাপূজা হয় মহা আড়ম্বরে। বাঙালী ছেলেমেয়েদের হাতে গড়া কারুশিল্পের প্রদর্শনী বসে। দিনের বেলায় বালক বালিকারা পায় প্রসাদ, নিশাযোগে থিয়েটারে গৌফ কামিয়ে মেয়ের পার্ট করে সখের দলের তরুণ সম্প্রদায়।

কালীমন্দিরে প্রতি অমাবস্যায় কালীকীর্তন হয়। শ্রামা বিষয়ক গান, কীর্তনের পদ্ধতিতে মূল গায়ন ও দোহার মিলে গাওয়া হয়। রচনা ভক্তিমূলক, সুর বৈচিত্রহীন। তাতে মহাজন পদাবলীর লালিত্য নেই, নেই সাধকের একক ভক্তিবিবেদনের গাঙ্গীর্ষ ও আবেগ। জিনিষটা সঙ্গীত শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত এবং ভক্তিতত্ত্বের দিক থেকে অনাবশ্যক অনুকরণ। সব দিক দিয়েই অসার্থক। কালীর অঙ্গনে, রামপ্রসাদী সুরে ভক্তের কণ্ঠে—

শ্মশান ভালো বাসিস বলে,
শ্মশান করেছি এ হৃদি,
শ্মশানবাসিনী শ্রামা,
নাচবি বলে নিরবধি।

জাতীয় গানই হচ্ছে শেষ কথা।

গানের আসরে যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে গভীর পরিচয় ঘটলো তাঁর নাম মোহিতকুমার সেনগুপ্ত। বয়স পঞ্চাশের ওপারে, শরীর অক্লশ, দৈর্ঘ্য সাধারণ বাঙালীজনোচিত। অডিট একাউন্টস সার্ভিসের লোক। সুদক্ষ অফিসার বলে খ্যাতি আছে সরকারী মহলে। বর্তমানে যানবাহন বিভাগের আর্থিক উপদেষ্টা। বেতন এবং পদমর্যাদা দুইই গুরুত্বপূর্ণ। এঁর আর দু'ভাইর নাম বাংলা-দেশে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সুপরিচিত। পরীক্ষার আগে এম. সেনের ইকনমিক্স ও মিহির সেনের সিভিকস্ পড়েনি এ-দশকে এমন বিদ্যার্থীর সংখ্যা বেশী নেই। ছাত্রজীবনে সেনগুপ্ত নিজেও প্রথিতযশা ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজীনের তিনি দ্বিতীয় ছাত্র-সম্পাদক।

ভদ্রলোক মৃতদার, অমায়িক এবং নয়াদিল্লীর বাঙালীর সমাজে যথেষ্ট সম্মানিত। বাঙালীদের সমুদয় ক্রিয়া কর্মে যোগ আছে ঘনিষ্ঠ। কীর্তনের আসরে তাঁর উপস্থিতি দেখা যায় অবধারিত।

ফ্লীট স্ট্রীটে আছে খবরের কাগজ, সেভিল রো'তে দরজি। নয়াদিল্লীর রিডিং রোডেও তেমনি মন্দির। একটি নয়, দুটি নয়, পর পর তিনটি। রাস্তাটার নাম টেম্পল স্ট্রীট হলে ক্ষতি ছিল না।

শ্রীযুগলকিশোর বিড়লার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরটি বোধ করি ভারতবর্ষে বর্তমান শতাব্দীতে নির্মিত সর্বশ্রেষ্ঠ দেবনিবাস। শুধু আকারে নয়, গঠন পারিপাট্যে ও অর্থব্যয়ের বিপুলতায় এর জুড়ি আছে বলে জানা নেই। দূর দূরান্ত থেকে আসে লোক। শুধু ভক্ত নয়, নিছক দর্শনাভিলাষীরাও। আসে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, পারসিক ও খৃষ্টান। আসে যুরোপীয় ও এমেরিক্যান টুরিস্ট। সকালে, সন্ধ্যায়, মধ্যাহ্নে নানা ভাবে, নানা দিক থেকে ফটো তুলে খালি করে ক্যামেরার স্পুল।

প্রায় বারো বছর আগের কথা। পিতার স্মৃতিচিহ্নরূপে যুগল কিশোর স্থাপন করতে চাইলেন একটি মন্দির, যেখানে হিন্দুমাত্রেরই

থাকবে অবাধ প্রবেশাধিকার। বিড়লাদের আদি বাস জয়পুরে, সেখানে এ-মন্দিরের সার্থকতা সীমাবদ্ধ। বছরে ক'জন লোক যায় সেখানে, কজন খবর রাখে সেখানকার? স্থান নির্বাচিত হলো দিল্লী, ভারতবর্ষের রাজধানী—শুধু আজকের ভারতবর্ষের নয়, শত সহস্র বৎসর থেকে। এখানে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেছে মহাভারতের কুরুপাণ্ডব, বাস করেছে সংযুক্তা পৃথ্বিরাজ। শিরিতে ছিল সম্রাট কুতুবুদ্দিন, লাল কেল্লায় রাজদণ্ড ধরেছে বাদশাহ সাজাহান। যমুনার দুই তীরের বিস্তীর্ণ প্রান্তর, আরাবল্লীর বনভূমি, অধুনা বিলুপ্ত জনপদের পথধূলিতে কত শক ছনদল, পাঠান, মোগল একাদেহে হলো লীন। ভাবীকালের ভারতবর্ষেরও দিল্লী হবে নগরমালিকার মধ্যমণি। আর যাই হোক, স্বাধীন ভারতের রাজধানী হবে না ওয়ার্ধা।

১৯৩২ সালে শুরু হলো মন্দিরের নির্মাণ কার্য। বহু এঞ্জিনিয়র, বহু কর্মী, শত শত রাজমিস্ত্রী, মুটে, মজুর খাটতে লাগলো ছ'বছর ধরে অবিশ্রাম। ১৯৩৮ সালে সম্পূর্ণ হলো মন্দির। লক্ষ্মীনারায়ণের আরাধনার স্থান, ধনকুবের বিড়লা ভ্রাতৃবর্গের পরলোকগত জনক রাজা বলদেও দাস বিড়লার স্বর্গার্থে উৎসর্গীকৃত।

মন্দিরের গঠনভঙ্গিটি ভারতীয় স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন। লাল পাথরের চূড়া, ধারগুলিতে আছে গৈরিক। মনে হয় যেন লাল জমিতে গেরুয়া পাড়। রাজপথ থেকে শ্বেত পাথরের অতি বিস্তীর্ণ সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। সেখান থেকে উঠেছে মন্দির। মেঝে ও দেয়ালে বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরখণ্ডের সমাবেশে রচিত বর্ণাঢ্য অলিম্পন ও পুষ্পসম্ভার। প্রাচীর গাত্রে আছে অজস্র ফ্রেস্কো পেইন্টিং। জয়পুর শিল্পবিদ্যালয়ের শিল্পীরা অঙ্কন করেছে সে-সব চিত্র। তাদের বিষয়বস্তু ও অঙ্কন চাতুর্য প্রশংসনীয়। জয়পুর শিল্পবিদ্যালয়ের যিনি অধ্যক্ষ—কোশল মুখার্জী—তিনি বাঙালী; নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলার উদ্ভাবক নন্দলাল, অসিতকুমার, সমর গুপ্ত প্রভৃতির

সতীর্থ। বিড়লা মন্দিরটির পরিকল্পনায়ও আর একজন বাঙালী স্থপতির যথেষ্ট অংশ আছে, এ-কথা জেনে আনন্দিত হওয়ার কারণ আছে আমাদের।

মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহ আছে শ্বেত পাথরের। প্রত্যহ অগণিত নরনারীর কুসুমার্ঘ্যে প্রায় আচ্ছন্ন তার চরণ ও পাদপীঠ। দ্বারে লৌহ-পেটিকা, উপরের ছিদ্রপথে ভক্তেরা রাখে প্রণামী। মন্দিরের বাম পার্শ্বে বিরাট ধর্মশালা, সেটি বিড়লা জননীদেবের স্মৃতি রক্ষার্থে। ধর্মশালার সংলগ্ন নাট মণ্ডপ। তাতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় ভজন সংগীত করেন সুকণ্ঠ গায়ক। সহস্রাধিক শ্রোতা অনায়াসে বসতে পারে সে সভায়। মাইক্রোফোনের সাহায্যে বাইরে সর্বসাধারণের শ্রবণায়ত্ত্ব করার ব্যবস্থাও নিখুঁত। মন্দিরপ্রবেশের বহু দূরে থাকতেই কানে এলো সে গান—

শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজ মন

হরণ ভব ভয় দারুণম

মন্দিরের পিছনে একটি বৃহদাকার পার্ক। এটি পরবর্তী রচনা। সাধারণ লোকের চমক লাগার মতো অনেক আয়োজন আছে এই পার্কে। পাথরের বিরাটকায় হস্তী, তার শুঁড় দিয়ে ফোয়ারার জল ঝরছে ঝর ঝর ধারায়। আছে পাথরের কুমীর, তারও মুখ দিয়ে নির্গত হচ্ছে জল। ফোয়ারা, পুষ্পবীথিকা, কৃত্রিম স্রোতস্বতী ও গিরিগহ্বর প্রভৃতি একাধিক আকর্ষণ আছে বালক, বালিকা ও দেহাতীদের। প্রতি দিন অপরাহ্ন বেলায় ভীড় জমে তাদের। কেউ বসে বিশ্রামবেদীতে, কেউ দোলে দোলনায়, কেউ বা পরিক্রমণ করে এদিক থেকে ওদিক। অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেননি শেঠ যুগলকিশোর। যুদ্ধ পূর্বকালের অর্থ মূল্যে মন্দির ও পার্কের নির্মাণ ব্যয় হবে প্রায় কুড়ি লাখ টাকা।

বিড়লা পরিবারের তিনজন, পাঞ্জাবের আর্য প্রতিনিধি সভার প্রতিনিধি তিনজন এবং স্থানীয় সনাতন ধর্মসভা থেকে তিনজন মিলে

এক ট্রাস্ট। তাঁরাই রক্ষণাবেক্ষণ করেন মন্দির এবং তার সংলগ্ন উদ্যান, ধর্মশালা প্রভৃতি। আধুনিক মনোভাবের পরিচয় আছে পরিচালন ব্যবস্থায়। প্রতিনিধিরা প্রতি তিন বৎসরান্তে নির্বাচিত হন। ছোট খাটো ব্যাপারেও আধুনিকতার ছাপ আছে। মন্দির প্রবেশের পূর্বে জুতা খুলে রাখবার ব্যবস্থাটি চমৎকার। সিঁড়ির ঠিক গোড়াতেই একটি ক্ষুদ্র কক্ষ। দেয়ালে জুতা রাখার র্যাক। সেখানে জুতা জমা দিতে হয়। মালিককে দেওয়া হয় সংখ্যায়ুক্ত কার্ডবোর্ডের একটি চাকতি। অনুরূপ আর একটি চাকতি এঁটে রাখা হয় জুতার গায়ে, যাতে একজনের হাইহিল লেডি'স স্নু'র সঙ্গে অন্ত্রজনের কাবুলী চঞ্চল বদল না হয়ে যায়। চাকতি ফেরৎ দিলেই ঠিক নিজের জুতাজোড়া এনে হাজির করে জুতাঘরের কর্মচারী, যেমন স্মাভয়, গ্রভনর বা কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ণে টুপী, ছাতা কিন্বা লাঠি।

১৯৩৮ সালে মহাত্মা গান্ধী দ্বার উদ্ঘাটন করেন এ-মন্দিরের। তাঁর চাইতে যোগ্যতর পুরোধা ছিল না এ-অনুষ্ঠানের। ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও হরিজনের সমান প্রবেশাধিকার যে মন্দিরে, তার দরজা তিনি খুলবেন না তো খুলবে কে? বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত রইল এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবাত্মার নাম।

বিড়লা মন্দিরের সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে তৃতীয় মন্দিরটি মূলতঃ বিড়লাদেরই অর্থানুকূল্যে নির্মিত। সেটি বৌদ্ধদের। বাঙালী কালীমন্দির ও লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের মাঝখানে এই ক্ষুদ্র মন্দিরটির অবস্থিতি ও গঠন কারো দৃষ্টি এড়াবার নয়। মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান তথাগতের ধ্যানগম্ভীর মূর্তি। পীতবসন ভিক্ষু আছেন কয়েকজন। তাদের মধ্যে একজন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কবির স্মৃতিচিহ্নরূপে একটি বকুল বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন মন্দিরাজনে। রবি-বকুল বৃক্ষ রোপণানুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেছিলেন একজন বাঙালী ঐতিহাসিক। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন। ভারত সরকারের দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষক, কিপার অব ইম্পিরিয়েল রেকর্ডস।

সেন মহাশয় এককালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপক ছিলেন। মহারাষ্ট্র ইতিহাসে তাঁর গবেষণার মূল্য ঐতিহাসিক যুগলীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত। স্বীত বেতনের সরকারী চাকুরীতে অনায়াস জীবন যাপন করেও যে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি সাহিত্য চর্চা করেন এবং অক্সফোর্ডের ডক্টরেট পাওয়ার পরেও যে স্বল্পতর ঐতিহাসিক বাংলায় ইতিহাস রচনা করেন, বঙ্গবাণীর সে-সেবকদের মধ্যে ডক্টর সেন বিশিষ্ট। এঁর পৈতৃকবাস বরিশাল জেলায়। বাচন ভঙ্গীতে তার আভাস পাওয়া যায়।

রিডিং রোডের একপাশে মন্দির, অন্য দিকে কোয়ার্টার। গভর্নমেন্টের কেরানী ও অনুরূপ কর্মচারীদের বাসস্থান। লম্বা একটানা ব্যারাক, কোনটার ইংরেজী L অক্ষরের মতো একপ্রান্ত প্রসারিত, কোনটা বা E'র মতো আকৃতি, শুধু মাঝখানের বাড়তিটুকু বাদ। সামনে খানিকটা মাঠ। মন্দির ও কোয়ার্টার,—সুন্দর এবং কুৎসিতের এত নিকট অবস্থিতি সচরাচর দৃষ্টিগোচর নয় কোনোখানে। এক একটা ব্যারাকে ত্রিশ, চল্লিশটি পরিবারের বাসব্যবস্থা। অল্প বেতনের কর্মচারীদের জন্য সুলভ সরকারী আয়োজন। এ-পাড়াটা নয়াদিল্লীর ইষ্ট এণ্ড।

দেখতে ভালো না হলেও থাকতে মন্দ নয় এই কোয়ার্টারগুলি। বিশেষ করে সুলভতা বিচার করলে অভিযোগ করার উপায় থাকে না। বেতনের এক দশমাংশ ভাড়া, মাসের শেষে আপিস থেকেই কেটে নেয় নিয়মিত। সেক্রেটারিয়টের কেরানীদের সর্ব নিম্ন বেতন ষাট টাকা। সুতরাং ছ' টাকা ভাড়ায় বাড়ি। দু'খানা শোবার ঘর, একখানা রান্নার, একটি ভাড়ার। ভিতরে একটু উঠান, বাইরে ছোট বারান্দা। জলের কল আছে, বাথরুম আছে, আছে ইলেকট্রিক

যেন,—আছে বড় একটি সিলিং ফ্যান বাড়িতে বৈদ্যুতিক কাসে, এবং ধুলিরও বাধা নেই। কলকাতা সহরে এমন ভাড়ায় এমন বাড়ি কোটিকে গুটিক মিলে না

শুধু বাড়িই নয়। ফার্নিচারও। বিবাহ সভায় সালঙ্কারা কণ্ঠা সম্প্রদানের মতো। গভর্নমেন্টের বাড়ি ও আসবাবপত্র পাওয়া যায়। সেন্ট্রাল পি. ডব্লিউ. ডির ফার্নিচার। ছ' টাকা মাসিক ভাড়াই পাওয়া যায় ছ'খানা তক্তপোষ, একটি আলমারী, একটি টেবিল ও তিনখানা চেয়ার।

এক একটা ব্যারাক ও তার সামনের খোলা মাঠটুকু নিয়ে এক একটা 'স্কোয়ার'। অধিকাংশই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাদের নামের দ্বারা গৌরবান্বিত। ক্লাইভ স্কোয়ার আছে সেই ইংরেজ ভদ্রলোকের নামে যিনি পলাশীর আত্মকাননে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন। যিনি আশী টাকা বাৎসরিক বেতনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামান্য কেরানীরূপে ভারতবর্ষে এসে দেশে ফিরেছিলেন ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনশালীরূপে। ১৭৪৪ সালে মাদ্রাজে আগত খ্যাতিহীন, বিত্তহীন রবার্ট ক্লাইভ ১৭৬০ সালের ৯ই, যখন সেনানায়ক ক্লাইভ রূপে প্রত্যাবর্তন করলেন ইংলণ্ডে, জাহাজ থেকে অবতরণ করলেন পোর্টসমাউথ বন্দরে, তখন ইংলণ্ডের এ্যান্ড্রুয়েল রেজিস্টারে তার মন্তব্য ছিল, "এই কর্নেলের কাছে নগদ টাকা আছে প্রায় দুই কোটি, তার স্ত্রীর গহনার বাক্সে মণিমুক্তা আছে দুই লাখ টাকার। ইংলণ্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডে তার চাইতে অধিকতর অর্থ নেই আর কারো কাছে।"

স্কোয়ার আছে লর্ড ডালহৌসীর নামে, যিনি একে একে পঞ্জাব, ব্রহ্মদেশ যোগ করলেন ভারত সাম্রাজ্যে, জোর করে দখল করলেন পেশোয়াদের সাতারা, কেড়ে নিলেন ঝাঁসি, নাগপুর, নিজামের বেঙ্গল, নবাব ওয়াজেদ আলীশাহ'র কাছ থেকে অযোধ্যা।

স্কোয়ার আছে ওয়ারেন হেস্টিংসএর নামে, যিনি কাশীনরেশ চেং সিংহের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন বহু লক্ষ মুদ্রা, অযোধ্যায় বেগমদের পীড়ন করে অর্থ ও মণিমুক্তা সংগ্রহ করেছিলেন ন্যূনাধিক দেড় কোটি টাকার। যার কুশাসন, কুকার্যের সুদীর্ঘ তালিকা ব্রিটিশ

পার্লামেন্টের বিচার সভায় অভূতপূর্ব বাগ্মিতায় উদ্ঘাটিত করেছিলেন এড্‌মণ্ড বার্ক। সে অপকীর্তির রোমহর্ষক বর্ণনা শুনে পার্লামেন্ট-কক্ষে দর্শকের গ্যালারীতে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন একাধিক ইংরেজ রমণী।

আর আছে সিপাহী যুদ্ধের ছোট বড় ও মাঝারি ইংরেজ সেনাপতিদের নাম। হেভলক্ স্কোয়ার, আউটরাম স্কোয়ার, উইলসন স্কোয়ার, নিকলসন স্কোয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি। স্কোয়ার নেই শুধু মেজর জেনারেল হিউয়েটের নামে যিনি ১৮৫৭ সালের ৯ই মে মীরাত সেনানিবাসে ৮৫ জন ভারতীয় সিপাহীকে হাতে পায়ে লোহার শক্ত বেড়ী পরিয়ে সমস্ত সৈন্যদলের সামনে লাঞ্চিত করেছিলেন। সেদিন নিরুপায় ভারতীয় সিপাহীরা দাঁড়িয়ে দেখেছিল তাদের সঙ্গীদের এই অবমাননা। তাদের মুখে ছিল না প্রতিবাদ, কিন্তু চোখে ছিল আগুন। সে আগুন সহজে নেভেনি।

পরদিন রবিবার। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসন্ন রজনীর ঈষৎ অন্ধকার নামলো মীরাতের ছাউনীতে। ব্রিটিশ সৈন্যেরা তৈরী হয়েছে চার্চ-প্যারেডের জন্তু। ভারতীয় সৈন্যেরা করছে কী? বোধ হয় বিশ্রাম। এমন সময় অকস্মাৎ আওয়াজ এলো।—

গুড়ুম!

পদাতিক বাহিনীর সিপাহীরা অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরছে ব্রিটিশ সেনানায়কদের ঠিক ললাটে। বন্দুকের ঘোড়া টিপছে, ক্লিক্, ক্লিক্, ক্লিক্। আকাশ, বাতাস, প্রাচীর ও প্রান্তর কাঁপিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে গুড়ুম! গুড়ুম!! গুড়ুম!!!

উত্তর ভারতে সিপাহী যুদ্ধের সেই হলো প্রারম্ভ।

নেতৃত্ববিহীন, অসজ্জবদ্ধ পরিচালনা, পরিকল্পনাহীন পদ্ধতি, বিভিন্ন অংশে যোগাযোগশূন্যতা এবং কেন্দ্রীয় নির্দেশের অভাবে ব্যর্থ হলোও একথা আজ স্বীকার করতে হয় যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাবার ও স্বরাষ্ট্র গঠনে ভারতীয়দের সেই প্রথম উদ্যোগ।

মৌরাটের সিপাহীরা ঘোড়া ছুটিয়ে পরদিন প্রভাতে এসে পৌঁছল দিল্লীতে। বাদশাহ বাহাদুর শাহ তখন দিল্লীর মসনদে। বাবরের বিক্রম, আকবরের ব্যক্তিত্ব বা আওরঙ্গজেবের রণকুশলতার লেশ ছিল না এই বৃদ্ধ, মুঘল সম্রাটের চরিত্রে। সিপাহীদের শৌর্য, শক্তি ও যুদ্ধোপকরণ কাজে লাগাবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। জনসাধারণের সংগ্রামোন্মুখ ব্রিটিশ বিদ্রোহকে সফল পরিণতি দান করতে পারলেন না তিনি।

দিল্লীর পরিধি সাত মাইল। অধিবাসীরা উত্তেজিত। ইংরেজের শিবিরে শিক্ষিত ও ইংরেজের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত চল্লিশ হাজার রণনিপুণ সিপাহী তার পাহারা। নগর প্রাচীরের উপরে ১৪টি বৃহদাকার কামান। দুর্গাভ্যন্তরে বৃহত্তম বারুদখানা। তা' ছাড়া আছে আরও ৬০টি ছোট ছোট কামান। আছে বহু সুদক্ষ গোলন্দাজ ;—বেশীর ভাগই দুদিন পূর্বে ছিল ব্রিটিশ সৈন্যদলভুক্ত। তারা যুরোপীয় যুদ্ধ-রীতিতে সুশিক্ষিত, সুশৃংখলাবদ্ধ এবং সুনিপুণ। দিল্লী দুর্গকে সুরক্ষিত করেছে ভারতীয় এঞ্জিনিয়ারেরা যারা আধুনিকতম এঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান লাভ করেছে ইংরেজের সেনাবাহিনীতে। দিল্লী অধিকারের ক্ষীণতম আশার কারণ ছিল না 'রীজে' সমবেত ব্রিটিশ বাহিনীর মনে। লেশমাত্র যুক্তিযুক্ত সম্ভাবনা ছিল না দুর্গপতনের।

কিন্তু তবুও সিপাহীরা হারলো। দিল্লী দখল করলো ইংরেজ। ভারতে মুসলিম রাজত্বের ঘটলো সমাপ্তি। শতবর্ষ পূর্বে নির্মিত সম্রাট সাজাহানের লাল কেল্লার শীর্ষে উত্তোলিত হলো ব্রিটিশ পতাকা।

নগরপ্রান্তে রীজের ইংরেজ শিবিরে সৈন্য সংখ্যা ছিল চোদ্দ হাজারের সামান্য কিছু বেশী। এর সবই যুরোপীয় নয়। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ছিল ভারতীয় সেপাই। আড়াই হাজার সৈন্য—বলা বাহুল্য, তারাও ভারতীয়—পাঠিয়েছিলেন ইংরেজানুরাগী দেশীয় রাজস্ববর্গ। তাঁদের জ্ঞান আজ একুশ, এগারো বা পাঁচ, সাত করে তোপধ্বনির বিধি আছে।

কর্নাল থেকে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে ব্রিটিশবাহিনী এসে শিবির স্থাপন করল রীজে, যেখানে এখন দিল্লী ইউনিভার্সিটি। বর্তমান সমাজীমণ্ডীতে ঘটেছে দীর্ঘকালব্যাপী অনেক খণ্ড যুদ্ধ। ইংরেজ সৈন্যদের সেই অস্থায়ী আবাস ভূমিতে পরে রচিত হয়েছে পুরাতন ভাইসরিগ্যাল লজ। সেখানে বসে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীরা, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রীর বা ইকনমিকসের নোট টোকে। তারই অনতিদূরবর্তী একটি ভবনে ১৯২৪ সালে তিন সপ্তাহের অনশন করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী,—দিল্লীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিবাদকল্পে। প্রথম সর্বদল মিলনের প্রচেষ্টায় সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন পণ্ডিত মালবীয়জী।

ইংরেজ জানতো অনতিবিলম্বে দিল্লী অধিকার করতে না পারলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হবে চিরতরে। তাই সর্বস্ব পণ করলো তারা। জিতি তো বাদশাহ, হারি তো ফকির। ব্রিগেডিয়ার আর্কডেল উইলসন তখন ব্রিটিশ শিবিরের অধিনায়ক। তিনি জয় সম্পর্কে আশাব্যিত ছিলেন না।

গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা অতীত, শরতের প্রথমার্ধও বিগতপ্রায়। অর্ধেকের উপর ইংরেজ সৈন্য জ্বর, উদরাময় ও অন্যান্য ব্যাধিতে রুগ্ন। পঞ্জাব থেকে সেনাপতি লরেন্স ক্রমাগত উৎকণ্ঠিত পত্র পাঠাচ্ছেন,—আর কতদিন? দিল্লী বিজয়ের আর বিলম্ব কত? সমগ্র ভারতবর্ষে একমাত্র পঞ্জাবেই সিপাহীরা তখনও আছে অলুগত, আস্থালার সেনানিবাসে দেখা দেয়নি বিক্ষোভ। কিন্তু আর বেশী দিন শান্তি রক্ষা কঠিন হবে। দিল্লী, দিল্লীর উপরেই নির্ভর করছে ভারতবর্ষে জন্ কোম্পানীর ভাগ্য।

অবশেষে সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে ফিরোজপুর থেকে হস্তীপৃষ্ঠে বাহিত প্রচুর গোলা বারুদ ও অন্যান্য আগ্নেয় অস্ত্র এসে পৌঁছল রীজের ছাউনিতে। ব্রিটিশ সেনানায়কদের প্রাণে ফিরে এল ভরসা, মনে এলো সাহস। সেনাপতি উইলসনকে অতিক্রম করে যুদ্ধ পরিচালনার ভার গ্রহণ করল জন নিকল্‌সন।

১৪ই সেপ্টেম্বর। রাত্রি প্রায় নিঃশেষিত, যদিও আলোর রেখা দেখা দেয়নি আকাশে। ইংরেজ বাহিনী আক্রমণ করলো দিল্লী দুর্গ। পূর্ববর্তী ছয় দিন দিবারাত্রি ব্যাপী গোলাবর্ষণের দ্বারা নগর প্রাচীর বিধ্বস্ত করা হয়েছে ধীরে ধীরে—মূল আক্রমণের মুখবন্ধরূপে। কাশ্মীরী গেটের দিকে খণ্ড খণ্ড দলে হানা দিল ইংরেজের সৈন্য। দুই পক্ষের কামান গর্জনে ছুরু ছুরু কম্পিত হলো দূর দূরান্তের গৃহগবাক্ষ, তাদের অগ্নি বর্ষণের রক্তিম আভায় সীমন্তিনীর সিঁথির মতো রঞ্জিত হলো প্রভাতের বিস্তীর্ণ আকাশ।

এই মরণপণ যুদ্ধ চললো প্রহরের পর প্রহর। অবশেষে বিকট শব্দে কাশ্মীরী গেটের রুদ্ধদ্বার বিধ্বস্ত হয়ে পড়লো ধূলায়। এঞ্জিনিয়ার বিভাগের ক্ষুদ্র একটি দল সরীসৃপের মতো বেয়ে উঠেছে প্রাচীরে। বিস্ফোরকে অগ্নি সংযোগের দ্বারা বিচূর্ণ করেছে সুদৃঢ় কাশ্মীরী গেট। তাদের অমানুষিক সাহসের ফলেই জয়লাভ সম্ভব হলো ইংরেজের। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেছেন, এই দলের মধ্যে আটজন ছিল ভারতীয়।

সেই ভগ্নদ্বার পথে জয়দৃপ্ত ব্রিটিশ বাহিনী প্রবেশ করলো ভীমবেগে। বিপক্ষকে আক্রমণ করলো দ্বিগুণ তেজে। উন্মুক্ত তরবারি হস্তে নিকলসন পরিচালনা করছিলেন সেই সৈন্যদল। জনৈক সিপাহী নিশানা করলো তাকে। আতর্নাদ করে ধূলায় পড়লো নিকলসন। গুলী লেগেছিল তার কপালে।

পরাজিত বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ পলায়ন করলেন দুর্গ থেকে। আত্মগোপন করলেন দিল্লী প্রাসাদের চার মাইল দক্ষিণে হুমাযুনের সমাধি সৌধে। সেখানে এক মুসলমান ফকিরের নিলেন আশ্রয়। জনশ্রুতি এই যে সেই ফকিরই তাঁকে ধরিয়ে দিলেন ইংরেজের গুপ্তচর বিভাগের এক তরুণ কর্মচারী হড্‌সনের হাতে।

হামা আজ দস্তে

গয়ের নালা কুনান্দ,

শাদী, আজ দস্তে

খেশ্তান্ ফরিয়াদ্ ।

নিজের হাতই যখন নিজের গালে চড় বসিয়ে দেয়, তখন, শাদী, অপরের হাতে মার খাওয়া নিয়ে আর খেদ করে লাভ কী !

বন্দী সম্রাটকে হড্‌সন্ পাল্‌কী করে নিয়ে এলো দিল্লীতে । সেখানে বিচার হলো তাঁর । দণ্ড হলো নির্বাসন । ব্রহ্মদেশে । সেখানে পাঁচ বছর পরে বন্দীদশায় জীবনান্ত ঘটলো তাঁর । হতভাগ্য বাহাদুর শাহ,—ভারতের শেষ মুসলিম সম্রাট ।

ঠিক যেখানে বাহাদুর শাহ ধৃত হন, হুমায়ুন'স্ টুয়েই পরদিন হড্‌সন্ গ্রেপ্তার করলো আর তিনটি পলাতক । বাহাদুর শাহের দুই পুত্র ও এক পৌত্র । তাঁরা স্বেচ্ছায়ই ধরা দিয়েছিল । তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে তাদেরও বিচার হবে বাহাদুর শাহের মতো ।

হড্‌সন তাদের একটি ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে এল দিল্লীতে । দিল্লী গেটের কাছে এসে হড্‌সন থামালো সে-গাড়ি । বন্দুক নিয়ে নিজ হাতে পর পর গুলী করলো বন্দীদের ঠিক বুকের মাঝখানে । রাজরক্ত ঝর ঝর ধারায় গড়িয়ে পড়ল দিল্লীর ধূলি-ধূসর পথে । মৃতদেহ নিয়ে চাঁদনী চকের উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রকাশ্য প্রদর্শনী রূপে রাখা হলো তিন দিন । সম্রাটবংশধরদের বিকৃত মৃতদেহ দেখে শিউরে উঠল পথচারীর দল, বারম্বার অশ্রুসিক্ত চক্ষু মার্জনা করল নিঃশব্দে ।

সাত

সাধবী স্ত্রী, পিতৃভক্ত পুত্র, ভ্রাতৃবৎসল অনুজ এবং প্রভুপ্রাণ সেবকের দৃষ্টান্ত আছে আমাদের পুরাণ ইতিহাসে একাধিক। জনকতনয়া সীতা, দশরথঅজ রামচন্দ্র, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এবং রামানুচর হনুমানের কাহিনী জানে এদেশের আপামর সাধারণ। কিন্তু পত্নী-অনুগত স্বামীর উদাহরণ জানতে চাও তো সর্বাত্রে দেখে আসা প্রয়োজন ন'মাসিমার বান্ধবী ইন্দুমতী রায়ের বর প্রিয়নাথ বাবুকে। ইন্দুমতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী শ্রীপ্রিয়নাথ রায়।

প্রাগ্ বৈবাহিক জীবনের পরিচয়লিপিতে ইন্দুমতী ছিলেন দাশগুপ্তা। গোথলেতে পড়েছেন ইংরেজী, সঙ্গীত সম্মেলনীতে শিখেছেন সেতার। ফুল স্লিভসের ব্লাউজ গায়ে দিয়ে মাঘোৎসবের দিনে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় করেছেন গান। তাঁর এক দাদা রেলের অফিসার, অন্য ভাই ব্যারিস্টার। ইন্দুমতীর বাবার সিন্দুকে রূপা ছিল প্রচুর, কিন্তু নিজের দেহে রূপ ছিল না এতটুকুও। ফলে কয়েক বছর আই. সি. এস., বিলাত ফেরৎ, ডেপুটি প্রভৃতির জগৎ অযথা অপেক্ষার পর অবশেষে যৌবনের প্রাপ্ত সীমায় পৌঁছে এক শুভ মাঘী মাসি শুক্লপক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ কঠলগ্না হলেন প্রিয়নাথবাবুর। বিয়ের পরে কনের বদল হলো পদবী, বরের বৃদ্ধি হলো পদ। এ্যাসিস্টেন্ট থেকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট। পয় আছে ইন্দুমতীর।

প্রিয়নাথবাবু তাঁর স্ত্রীর নাথ তো নিশ্চয়ই, বোধ করি প্রিয়ও হবেন। হওয়াই উচিত। কিন্তু আমার পক্ষে.....। থাক্ সেকথা। আমি তো আর তাঁকে জামাই করছি নে।

মহাদেও রোডে প্রিয়নাথবাবুর বাড়িটি। বি টাইপ কোয়ার্টার। নয়াদিল্লীতে বাজারে ডিম থেকে শুরু করে বসত বাড়ি পর্যন্ত সবই

গ্রেড করা।-এ, বি, সি, ডি ইত্যাদি। হীরার বিচার ঔজ্জ্বল্যে, মসলিনের বিচার সূক্ষ্মতায়। সরকারী কর্মচারীর মূল্য নিরূপিত হয় বেতনে। পি, ডব্লিউ, ডি'র খাতায় বেতন অনুযায়ী ভাগ করা আছে বাড়ি। পাঁচ শ' থেকে ছ'শ টাকা মাহিনার কর্মচারীর জন্য 'এ' টাইপ কোয়ার্টার, চার শ' থেকে পাঁচ শ'ওয়ালারা পায় 'বি'। ছ'শর উপরে মাইনে যাদের তারা পায় বাংলো। তারও শ্রেণী বিভাগ আছে। শুধু গঠন বা ব্যবস্থায় নয়, অবস্থানেও। ঠিকানা শুনেই বলে দেওয়া যায় লোকটার বেতনের পরিমাপ। হেস্টিংস রোডের বাসিন্দা পায় তিন থেকে চার হাজার, তোগলক রোডে তার নীচে। এক হাজারের বেশী না পেলে বাংলো মেলে না রাইসিনা রোডে।

নম্বর মিলিয়ে সন্ধান করলেম বাড়ির। বারান্দার পাশের ঘরে আধময়লা গেঞ্জী গায়ে একটি ভূত্য ইলেকট্রিক ইস্ত্রী দিয়ে একখানা চকোলেট রং বেনারসী শাড়ীর পরিচর্যায় ব্যস্ত। জিজ্ঞাসা করলেম,

“এইটে প্রিয়নাথবাবুর বাড়ি?”

“হ্যা, মিঃ রায়ের বাড়ি।”

গলার স্বরে বিরক্তি এবং কপালে কুঞ্চিত রেখা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা গেল বাবু সংশোধনটা শ্রোতার পক্ষে শ্রবণসুখকর নয়। সুতরাং ভ্রম সংশোধন করতে হলো।

“মিঃ রায়কে একটু খবর দিতে পার?”

“আমিই মিঃ রায়।”

গড সেভ্‌ দি কিং! মিসেস ইন্দুমতী রায়ের স্বামী যে সকাল আটটার সময় শাড়ী ইস্ত্রি করবেন তা' কল্পনা করব কেমন করে? কিন্তু এখন তো আর ফিরবার উপায় নেই। ন' মাসিমার সঙ্গে তাঁর-স্ত্রীর সম্পর্ক ব্যক্ত করতে হলো, দিতে হলো সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়। মিঃ রায় অন্দর থেকে যথারীতি নির্দেশ লাভ করে ড্রয়িং রুমে নিয়ে বসালেন। “উনি” চান করছেন, আসতে বিলম্ব হবে না আশ্বাস দিলেন।

ড্রয়িং রুমটির মেঝেতে সতরঞ্চি পাতা, তার উপরে ছোট মির্জাপুরী কার্পেট। টিপাইর উপরে পুষ্পহীন ফুলদানী। এক কোণে একখানা রাজকরা কেশিসের ইজিচেয়ার। তার মাথার কাছটা উপবেশনকারীদের তলসিক্ত শিরের অজস্র চিহ্নের দ্বারা মলিন। দেয়ালে কাঁচ দিয়ে বাঁধানো খান দুই সূচীশিল্পের নমুনা। এই সিবন কারুকর্মের শিল্পীর পরিচয় সম্পর্কে দর্শকের মনে পাছে কিছুমাত্র সংশয় না ঘটে সেজন্য বড় বড় হরফে এক কোণে লেখা আছে “ইন্দু”। একটাতে একটা ফুরি, তাতে কয়েকটি গোলাপ ফুল। আর একটাতে একটা বিচিত্র বর্ণের কুকুর। লাল, নীল, সবুজ, হলদে রংএর যদৃচ্ছ এবং অকুণ্ঠ ব্যবহার। ‘ভিবজিওর’ বললেই হয়। কুকুরটির মাথার উপরে ইংরেজী অক্ষরে লেখা,—গড ইজ গুড। বোঝা গেল গৃহস্বামিনী ধর্মশীলা। কিন্তু সেটা প্রমাণের জন্য তো সারমেয়ের প্রয়োজন ছিল না। বোধ করি, লেখার ভুল। ডগ ইজ গুড হবে।

প্রিয়নাথবাবুর সঙ্গে খানিক আলাপ করা গেল। আলাপ অর্থে তিনি বক্তা, আমি শ্রোতা। প্রায় সবটাই ‘উনি’ প্রসঙ্গ। উনি খাবার বিছানায় এক পেয়লা গরম চা না পেলে উঠতে পারেন না। উনি রোজ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ঠাকুরকে চাল ডাল মেপে দেন। বাজারের খাবার উনি বাড়ির ত্রিসৌমানায় আসতে দেন না। নয়াদিল্লী বঙ্গ মহিলা সমিতির যা কিছু তাতো সব উনিই করেন। লডী মিত্র তো উনি ছাড়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইন্দুমতী রায়ের প্রবেশ। মিঃ রায়ের উত্থান। সেটা ইংরেজী রীতি। গৃহস্বামিনী রায় আসন পরিগ্রহ করলেন। প্রথমে গৃহে স্থানভাবের বিস্তৃত বর্ণনা দিলেন। তবে ছ’মাস পরেই গুরুদ্বোয়ারা রাতে বাংলা পাওয়ার আশা আছে। এ বাড়িতে ঘরদোর ইচ্ছেমত দাজাতে পারেননি। তবুও তো সিমলা থেকে যে-সব আসবাব পত্র এনেছেন তার সব এখনও প্যাকিং খোলা হয়নি (সিমলা থেকে এসেছেন এই ছ’মাস হলো)। ফী বছর দিল্লী-সিমলা করেন।

গ্রীষ্মকালে দিল্লীতে এই প্রথম। এবার গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার শৈল-বিহার বন্ধ। নতুন কম্যাণ্ডার ইন চীফ নাকি বলেছেন, সিমলা গেলে যুদ্ধ জয়ে বিঘ্ন ঘটবে। শোন একবার যত অনাস্থ্যটির কথা। আরও বেশী গরম পড়লে কিন্তু তিনি সিমলা না গিয়ে পারবেন না, তা' বাপু, তোমরা যাই বল না কেন।

বেবী—অর্থাৎ ন'মাসিমা—এখন আছে কোথায়? তার মেয়ের বিয়ের কত দূর? ছেলে পড়ে কোন্ ক্লাশে? তাঁর নিজের চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস কম। অবসরও পান না। কত ঝামেলা! এই তো আজ চারটায় আছে এক পার্টি। হ্যাঁগা, শাড়ীটা ইস্তিরি করে রেখেছ তো?—প্রিয়নাথবাবুর প্রতি।

হাতের ঘড়ির পানে তাকিয়ে বিদায় প্রার্থনা করলেম।

এখনই উঠবে? হাঁ, তা বেলা হয়েছে বটে। আচ্ছ ক'দিন! দিল্লী থেকে যাবে কোথায়? বিলেতের কী হলো? যুদ্ধ না থামলে তো আর যেতে পারছো না! বমিং এর সময় লগুনে ছিলে বুঝি? সেখানকার অবস্থা কী রকম? বাজারে ড্রিন স্যাম্পু পাওয়া যায়! ট্যাঙ্কি লিপস্টিক? এখানে তো ছাই কিছু মিলে না! আচ্ছা একটু চা টাও তো খেলে না। ওর আবার আপিসের বেলা হচ্ছে আচ্ছা আর একদিন এসে খেয়ে যেয়ো কিন্তু।

আরও একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার ফরমাস ছিল ঠিকানা জানা ছিল না। প্রিয়নাথবাবু, খুরি, মিঃ রায়কে জিজ্ঞাস করলেম,—“ভি. আর. ভেক্টরশরণের বাড়িটা কোথায় জানেন? কোন্ ডিপার্টমেন্টের যেন এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী?”

“প্রচণ্ড বিক্ষোভ” বলে একটা কথা বাংলা পত্রিকায় আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। সেটা ঠিক কী রকম জানা ছিল না। প্রিয়নাথ রায়ের অবস্থা দেখে কিছুটা অনুমান করতে পারলেম।

“এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী! ভেক্টরশরণ বলেছে বুঝি? চাল কেবল চাল। চাল দিতে দিতেই গেল মাদ্রাজীটা। জানে আপনি

নতুন লোক, ধরতে পারবেন না। এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী, হুঃ।
রিটায়ার করার ছ এক বছর আগে যে হতে পারে সেতো ভাগ্যবান।
এখন যুদ্ধের বাজার। তাই সেকেণ্ড ডিভিসন ক্লার্কেরা পর্যন্ত
সুপারিনটেন্ডেন্ট হচ্ছে। নইলে মশায়, এ্যাসিস্টেন্ট হতেই যে চুলে
পাক ধরে। আমি যেবার সুপারিনটেন্ডেন্ট হলাম, উডহেড সায়েব,
—স্মার জন উডহেড, পরে বাংলাদেশের গভর্নর অবধি উঠলো,—
ডেপুটি সেক্রেটারী। ডেকে বললেন, রয়, তোমার মতো এমন
কাজের লোক.....।”

অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেম। অনিচ্ছাক্রমে এবং নিজের অজ্ঞাতেও
যে অপর লোকের গভীর মনস্তাপের কারণ হতে হয়, তারই দৃষ্টান্ত।

ভেক্টরশরণের গৃহ আছে, গৃহিনী নেই। থাকলে বিপদ ছিল।
তিনি প্রাচীনপন্থী হলে তাকে গলায় দড়ি দিতে হতো, আধুনিকা
হলে প্রথমে স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে পলায়ন এবং পরে বাংলা সিনেমার
নায়িকা। মাতাল বর নিয়ে ঘর করা যায়, কলহ করা যায়
অন্যানুরাগী স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু উদাসীন ব্যক্তির স্ত্রী হওয়ার মতো
দুর্ভাগ্য নেই জগতে। প্রেম ভালো, বিদ্বেষ দুঃখের, কিন্তু সব চেয়ে
মারাত্মক ইণ্ডিফারেন্স—যে কাছেও টানে না, দূরেও ঠেলে না—শুধু
ভুলে থাকে।

ভক্তেরা বলেন, ধ্যান, জ্ঞান, নিদিধ্যাসন সমস্তই ভগবানে
উদ্ভিষ্ট না হলে ঈশ্বর লাভ ঘটেনা। বরদারাজলু ভেক্টরশরণ ভগবান
প্রাপ্তির জন্য উদ্গ্রীব নন। কিন্তু ভক্তের ঐকান্তিকতা নিয়েই
আরাধনা করছেন সেক্রেটারিয়টের। আপিস, আপিস, আর
আপিস। কাজ, কাজ, আর কাজ।

সকালে সাড়ে নটায় সবে মাত্র ফরাস যখন ঘর ঝাঁট দিয়ে গেছে
তখন এসে বসেন টেবিলে। অপরাহ্ন গড়িয়ে যায় সন্ধ্যার আঁধারে,
উষা ও অধস্তন কর্মচারীরা চলে যায় নিজ নিজ বাসায়, সহকর্মীরা
একে একে করে প্রস্থান। একা ভেক্টরশরণ কাজ করে যান

অনন্তমনা। বাড়ি ফিরেন কখনও রাত আটটায়, কখনও বা তারও পরে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত ঐ একই ধারা। ছুটি নেই, ক্যাসুয়েল লীভ নেই। রবিবারে ছপুয়ে অনেক দিন চলে আসেন আপিসে। ফাইল নিয়ে লেখেন নোট, ফ্ল্যাগ দিয়ে দাগ দেন, “ফ্রেস রিসিট” অথবা “পি. ইউ. সি.—পেপার আণ্ডার কনসিডারেশন।” বন্ধু বান্ধবেরা ঠাট্টা করে বলে, ভেক্ট, কেবল খেটেই গেলে, জীবনটা ভোগ করবে কখন?

ভেক্টশরণ হাসেন আর ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়েন। বোধ হয় মনে মনে বলেন, কী বুদ্ধি! হোয়াটে ফুল! ভোগ? হুঃ, থার্ড ডিভিসন ক্লার্ক থেকে সেক্রেণ্ড, সেক্রেণ্ড থেকে এ্যাসিস্টেন্ট, এ্যাসিস্টেন্ট থেকে সুপারিনটেন্ডেন্ট, সুপারিনটেন্ডেন্ট থেকে এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী। অনেকটা পাল্লা। ভোগের জন্তু জীবন তো আছেই পড়ে। চাই প্রমোশন, চাই উন্নতি। চাকুরী রে, তুঁছ মম শ্যাম সমান।

ভেক্টশরণের এক অনুজ ছিলেন বিলাতে। আই. সি. এস. মানসে। সেখানেই পরিচয়। ভাই এর অধ্যবসায় লক্ষ্য করেছি তারও চরিত্রে। আশা করি, একদা সিভিল লিস্টের পাতায় নাম ছাপা হবে সগৌরবে।

ভেক্টশরণের স্বজাতীয়েরা নয়াদিল্লীতে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারত সরকারের দপ্তর গোড়াতে ছিল কলকাতায়। লালদীঘির কাছে যে বাড়িতে এখন বাংলার লাট থাকেন, সেখানে বসতি ছিল ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে লর্ড হার্ডিঞ্জের। তখন সেক্রেটারিয়টে বাঙ্গালী ছিল বহু। পরে রাজধানী স্থানান্তরিত হলো দিল্লীতে। তখন থেকে তাদের সংখ্যা হয়েছে হ্রাস। অতঃপর পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটি নানা জাতি এসেছে ধীরে ধীরে। দখল করেছে চাকুরীর মসনদ। সে-অভিযানে মাদ্রাজীরা সর্বাগ্রে। তারা খাটে বেশী, ফাঁকি দেয় কম।

নয়াদিল্লীতে মাদ্রাজীদের ক্লাব আছে, সজ্জা আছে, স্কুল আছে। বার্ডিং হাউসও আছে একাধিক। সেখানে স্কুলের ডেস্কের মতো ছোট ছোট টেবিল। তার উপরে কদলীপত্রে আহার। চার আনার মিলে স্বাথম, কুটু, সম্বর ও আশ্বালম। একজন মদ্রদেশীয়ের নিয়মিত খাওয়া। কোনদিন ওর সঙ্গে পাওয়া যায় তৈয়রপত্চত্তি অর্থাৎ নারকেলের কুঁচি সহযোগে দৈ। সেদিন তো রীতিমতো ভুরিভোজন।

শুধু অশনে নয়, বসনেও যথেষ্ট মিতাচারী দাক্ষিণাত্যের লোক। একখানা চাদর দ্বিখণ্ডিত করে হয় পরিধেয়, একটি সাধারণ ফতুয়া গাত্রাবরণ। কাঁধে একটি তোয়ালে, পায়ে একজোড়া স্যাণ্ডেল। রাস্। আপিস ছাড়া সর্বত্র স্বচ্ছন্দচিত্তে চলাফেরা করে এই বেশে। আর যাই হোক, পোষাক নিয়ে শোক করে না মাদ্রাজী কোনদিন।

তাদের মেয়েদেরও সজ্জা বাহুল্যবর্জিত। ভূষণ পরিমিত। অবশ্য সংখ্যায়। মূল্যে নয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত মাদ্রাজী গৃহিণীরও কানে আছে হীরার ফুল। তার দাম শুনে অনেক বাঙ্গালী স্বামী চোখে সর্ষে ফুল দেখবেন। বেশীর ভাগ মাদ্রাজী তরুণীদের রূপ নেই, কিন্তু রুচি আছে। তাদের গৃহদ্বার সকালে সন্ধ্যায় আলিম্পনের দ্বারা সুদৃশ্য, তাদের কবরীবন্ধন পুষ্পস্তবকে সজ্জিত। সঙ্গীতে দক্ষতা আছে প্রায় সবারই।

সব পরিচিত একজন পদস্থ মাদ্রাজীর গৃহে আমন্ত্রণ ছিল ডিনারের। ভদ্রলোক দু'হাজার টাকা মাইনে পান। অথচ আহারের আয়োজন দেখে রসনার বদলে চক্ষু জলসিক্ত হওয়ার উপক্রম। কিন্তু তার স্ত্রীর পারদর্শিতা আছে বীণা বাদনে। অপূর্ব সুর সৃষ্টি করলেন তারযন্ত্রে। জঠর যদিবা রইল অভুক্ত শ্রবণ হলো তৃপ্ত-মধুর। স্বচ্ছন্দ চিত্তে ক্ষমা করা গেল তার ভোজনসভার ব্যয়কুণ্ঠ আয়োজন।

মাদ্রাজীদের সঙ্গে পাঞ্জাবীদের তফাৎ এইখানে। আচার এবং আচরণে পাঞ্জাবীদের শুধু মডার্ন নয়, আলট্রা মডার্ন। যুবক, বৃদ্ধ

সবাই মিলে করছে উর্ধ্বশ্বাসে বিলাতীর নকল। শুধু ছেলেরা হলে ক্ষতি ছিল না। মেয়েরাও।

রেস, ক্লাব ও কার্নিভ্যাল—অতি আধুনিকতার এই তিন তীর্থক্ষেত্রে পাঞ্জাবী মহিলারাই প্রধান পাণ্ডা। তারা চার রাউণ্ড শেরী সাবাড় করতে পারেন হাসতে হাসতে। রজনীর শেষ প্রহর পর্যন্ত ফল্গুট নাচতে পারেন অক্লান্ত চরণে। তাঁদের দেহে শোভার চাইতে সম্ভার অধিক। তাঁরা বিয়ের আদিতে তষী, অস্ত্রে বিপুলা। তাঁদের বর্ণ গৌর কিন্তু আনন লালিত্যহীন। চাকর-চাকরাণীদের শাসন কার্যে স্বহস্তে উত্তম মধ্যম প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেন না এতটুকুও। দেহে কিম্বা মনে পাঞ্জাবিনীর নাইকো কোমলতা।

ভারতবর্ষে যুরোপীয় ভাবধারার প্রথম উন্মেষ ঘটলো বাংলাদেশে, ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতাকে প্রথম বরণ করলো বাঙালী। সে যুগের বাঙালীর প্রাণশক্তি ছিল প্রচুর, প্রতিভা ছিল প্রখর। ইংরেজের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে সে গলাধঃকরণ করলো না, করলো গ্রহণ। আপন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জারক রসে পরিপাক করে তাকে সে আত্মসাৎ করলো। পশ্চিমের চিন্তাধারাকে সে ধার করলো না, ধারণ করলো। তাই বাঙালীর মধ্যে সম্ভব হলো মাইকেল মধুসূদন, বিবেকানন্দ ও চিত্তরঞ্জন দাস। সাহিত্যে, শিল্পে ও ললিত কলায় বাংলাদেশ সূচনা করলো সমৃদ্ধিযুক্ত নবযুগের, আনলো দেশাত্মবোধের অভূতপূর্ব প্রেরণা। যৌবনকে দিল অভয়-মন্ত্র, নারীকে দিল আত্মচেতনা। সেদিন সর্ব ভারতের অধিনায়িকার আসনে অধিষ্ঠিতা হলেন বঙ্গজননী।

যুরোপের সংস্পর্শে সর্বশেষে এসেছে পাঞ্জাব। বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রায় শত বর্ষ পরে লর্ড ডালহৌসী দখল করেছিলেন পাঞ্জাব। কিন্তু যুরোপকে পাঞ্জাব অন্তরের মধ্যে পায়নি, শুধু বাইরে থেকে করেছে অনুবর্তন। যুরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সে অনুসরণ করেনি, অনুকরণ করেছে। সে ভারতবর্ষকে দেয়নি কাব্য,

দেয়নি সঙ্গীত, দেয়নি বিজ্ঞান। দিতে পারেনি দেশসেবার আদর্শ। আধুনিক ভারতবর্ষে তার দান একদল পি. ডব্লিউ. ডির এঞ্জিনিয়র, সৈন্যদলের সুবেদার এবং আই. এম. এসের ডাক্তার। একমাত্র লাজপৎ রায় ছাড়া পাঞ্জাবের আর কেউ হয়নি আজ পর্যন্ত কংগ্রেসের সভাপতি।

কলকাতার লালদীঘির জল সাদা এবং গোলদীঘির আকার চতুষ্কোণ। কিন্তু এখানকার গোল মার্কেট সার্থকনামা। সেটা গোলই বটে। চারটি রাস্তার সংগম স্থলে বৃত্তাকার দ্বীপের মতো এ-বাজারটি। দোতালা বাড়ি। উপরে দরজীর দোকান, নীচে শাকসব্জী মাছ, মাংস, ফল ইত্যাদি। পৃথক পৃথক কক্ষ। ইংরেজীতে লেখা আছে বিজ্ঞপ্তি,—কোনটাতে মাছ, কোনটাতে বা মাংস। প্রবেশ-পথগুলিতে সূক্ষ্ম তারের জাল-আঁটা দরজা। স্প্রিং দেওয়া আছে, যাতে আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। মাছের ঘরটিতে উঁচু সিমেন্টের বেদীতে রাখা হয় মাছ। তার উপর দিয়ে গেছে জলের কলের সছিদ্র পাইপ। ছিদ্রপথে অবিরাম বিন্দু বিন্দু করে ঝরছে জল। আপনি ধুইয়ে নিচ্ছে বেদীটি। আইসচেস্টের ভিতরে থাকে মাছ। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। মাছির উপদ্রব নেই, কদমাক্ত জল সিঁধনে পঙ্কিল হওয়ার আশঙ্কা নেই ক্রেতাদের বসন। মার্কেটের ছ'ধারে মনোহারী দোকান, মুদী ও ময়রা ইত্যাদি। বাঙালীর দোকান আছে কয়েকটি, তার মধ্যে একটিতে মিলে দৈ, সন্দেশ ও অন্যান্য বাঙালীর খাবার।

গোল মার্কেটের পথে আছে লেডী হার্ডিঞ্জ কলেজ, ভারতবর্ষে পুরুষের সম্পর্কশূণ্য একমাত্র মহিলা মেডিক্যাল কলেজ। বিদ্যার্থীণীদের মধ্যে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আছে, মাদ্রাজী আছে, মারাঠী আছে, আসামী আছে, বাঙালী নেই একটিও। পাঞ্জাবী এক অধ্যাপক বন্ধুর শ্যালিকা পড়েন ফোর্থ ইয়ারে। সুদর্শনা। বাংলার বাইরে কলেজে ইউনিভারসিটিতে সুন্দরীর সাক্ষাৎ মিলে। রূপের অভাবটাই

সেখানকার মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার কারণ নয়। পড়াশুনাটা নয় বিয়ের আগের স্টপ্‌গ্যাপ্‌।

মেয়েটি মেধাবী, ক্লাশে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন পরীক্ষায়। বললেন, মেডিসিনের চাইতে সার্জারীতে আগ্রহ বেশী। পাশ করে হবেন সার্জেন। সর্বনাশ!

প্রাচীনারা হাতে ধরতেন সমার্জনী। ঘরের মেঝে থেকে অবাধ্য স্বামীর পৃষ্ঠ পর্যন্ত সর্বত্র তার অপক্লপাত ব্যবহারের দ্বারা সংসার-যাত্রাকে তাঁরা নিরঙ্কুশ রাখতেন। আধুনিকাদের হস্তে শোভে ভ্যানিটি ব্যাগ। তার গর্ভে নিহিত প্রসাধন সামগ্রী নিজের স্বামীর হৃদয়ে ত্রাস এবং পরের স্বামীর হৃদয়ে চাঞ্চল্যের সঞ্চার করে। অতি আধুনিকারা যদি ধরেন ফরসেপস্ তবে বেচারী পুরুষ জাতিকে আত্মরক্ষা সমিতি স্থাপন করতে হবে অচিরে! রসবোধ আছে তরুণীর। কলহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

লেডী হার্ডিঞ্জের বাঙালী ছাত্রী না থাকলেও অধ্যাপিকা আছেন একজন। মহিলার এক ভাই আই. সি. এস., এক ভাই আই. এম. এস., দুই ভাই একাউন্টস্ সার্ভিসের উচ্চপদস্থ অফিসার। এক বোন শিল্পী। গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকার চিত্র সম্পাদিকা। অগ্ন্যাগ্ন ভাই বোনেরাও সকলেই কৃতী। তিনি নিজে ডব্লিউ. এম. এস. অর্থাৎ আই. এম. এসেরই মহিলা সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত। মাইনে পান অনেক, ডাক্তারী করে আয় করেন যথেষ্ট। ভদ্র ব্যবহার, অমায়িক ভাষণ, সহৃদয় আচরণ। লেডী-ডাক্তারী গন্ধ নেই তার চরিত্রে। কলেজের সংলগ্ন সরকারী কোয়ার্টার। সেখানে গৃহ সজ্জায় গৃহস্বামিনীর পরিচয় পরিস্ফুট।

নয়াদিল্লীতে মহিলা ডাক্তার আছেন একাধিক। যুক্ত প্রদেশের আছেন জন দুই। লেডী হার্ডিঞ্জের যিনি প্রিন্সিপাল তিনি মদ্রদেশীয়। একটি আছেন পাঞ্জাবী। এর জনক ধরমবীর পাঞ্জাবে